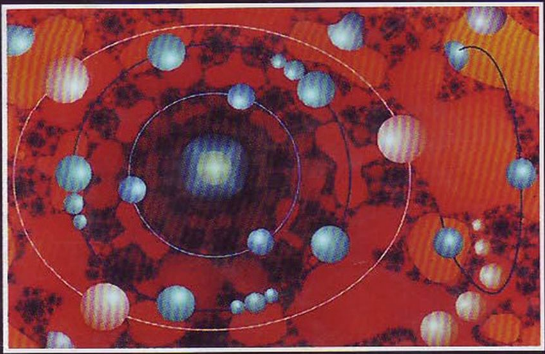

কোয়ান্টাম মেকানিক্স

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

1. 'হবে' না 'হতে পারে'?

বিজ্ঞানের ওপর মানুষের খুবই বিশ্বাস। আর কেনই বা বিশ্বাস হবে না—এই বিজ্ঞানের জন্যেই তো মানুষ প্লেনে করে আকাশে উড়ে পৃথিবীর এক মাথা থেকে অন্য মাথায় চলে যেতে পারে। বুকের ভেতর ব্যথা হলে বুক কেটে হৃৎপিণ্ডটা বের করে সেটাকে কেটেকুটে ঠিক করে আবার বুকের ভেতর ভরে সেলাই করে দিতে পারে। শুধু কি তা-ই? আকাশ থেকে একটা বোমা ফেলে এক মুহূর্তে একটা শহর ধ্বংস করে দিতে পারে, চোখের পলকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। আবার যে-রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেত তার টিকা আবিষ্কার করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচিয়েও ফেলতে পারে। এরকম উদাহরণ দিয়ে কি শেষ করা যাবে? কাজেই মানুষ যদি বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করে, যদি ভয় না পায়, আবার যদি ভরসা না করে তাহলে কার ওপর বিশ্বাস করবে, কাকে ভয় পাবে, কার ওপর ভরসা করবে?

বিজ্ঞানের ওপর মানুষের বিশ্বাস এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে যারা নিজের ধর্ম প্রচার করে আজকাল তারা একটু পরে পরে দেখানোর চেষ্টা করে তাদের ধর্মগ্রন্থ বিজ্ঞানসম্মত কিংবা এখন বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার হচ্ছে তার সবই তাদের ধর্মগ্রন্থে অনেক আগেই বলে দেওয়া ছিল!

যারা বিজ্ঞান নিয়ে অল্পবিস্তর কাজ করেছে তারা সবাই ভাবে বিজ্ঞান সবসময় সবকিছু নিখুঁতভাবে বলে দেয়—অন্তত বলার চেষ্টা করে। প্রকৃতি কী নিয়মে চলে বিজ্ঞান সেটাই বোঝার চেষ্টা করে, যখন বিজ্ঞান সেটা বুঝতে পারে তখন কখন কোথায় কীভাবে কী ঘটবে বিজ্ঞান সেটা আগে থেকে বলে দিতে পারে। উপরে একটা পাথর ছুড়ে দিলে সেটা কত উপরে উঠবে, আবার কতক্ষণ পর নিচে নেমে আসবে বিজ্ঞান সেটা নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারে। একটা আয়নায় আলোকরশ্মি

ফেললে সেই আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে কোনদিকে যাবে সেটাও বিজ্ঞান বলে দিতে পারে। একটা কেতলিতে পানি গরম করতে থাকলে সেই পানি ঠিক কোন তাপমাত্রায় ফুটতে থাকবে বিজ্ঞান সেই কথাটাও বলে দিতে পারে। কাজেই যারা বিজ্ঞানচর্চা করে তারা ধরেই নিয়েছে আমরা যখন বিজ্ঞান দিয়ে পুরো প্রকৃতিটাকে বুঝে ফেলব তখন আমরা সবসময় সবকিছু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। যদি কখনো দেখি কোনো-একটা-কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছি না তখন বুঝতে হবে এর পিছনের বিজ্ঞানটা তখনো জনা হয়নি, যখন জানা হবে তখন সেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। এক কথায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণী সবসময়েই নিখুঁত এবং সুনিশ্চিত।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স (Quantum Mechanics) বিজ্ঞানের এই ধারণাটাকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, প্রকৃতি আসলে কখনোই সবকিছু জানতে দেবে না, সে তার ভেতরের কিছু-কিছু জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ কখনোই সেটা জানতে পারবে না—সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা নয়। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা একটা পর্যায়ে গিয়ে কখনোই আর জোর গলায় বলেন না 'হবে' তারা মাথা নেড়ে বলেন, 'হতে পারে'। হবে না বলে হতে পারে বলাটাই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গোড়ার কথা!

2. আলো দিয়ে শুরু

কোয়ান্টাম মেকানিক্স শুরু করার জন্যে আলো খুব চমৎকার উদাহরণ হতে পারে। তবে এর আগে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া দরকার সবাই আলোর ব্যাপারটা মোটামুটি জানে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে-কয়টি চমকপ্রদ কাজ হয়েছে তার একটি হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ, এই সমীকরণ দিয়ে 1864 সালে ম্যাক্সওয়েল দেখিয়েছিলেন যে, আলো হচ্ছে এক ধরনের তরঙ্গ এবং এই তরঙ্গটি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার 3×10^8m/s বেগে ছুটে যায়। অর্থাৎ আলো হচ্ছে ধাবমান তরঙ্গ বা গতিশীল তরঙ্গ (Traveling Wave)।

আমাদের চারপাশের জগতে যে-তরঙ্গটা আমরা চোখে খুব ভালোভাবে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে পানির তরঙ্গ। নদীর মাঝখান দিয়ে একটা লঞ্চ যাবার সময় সেটি যে-ঢেউ বা তরঙ্গ সৃষ্টি করে সেটাও ধাবমান তরঙ্গ। তাই সেটা নদীর

মাঝখানে তৈরি হয়ে এক সময় তীরে এসে আঘাত করে। পুকুরে একটা ঢিল ছুড়লে সেই ঢিল ঢেউয়ের জন্ম দেয়। আর সেই ঢেউটা বৃত্তাকারে বড় হয়ে হয়ে তীরে এসে পৌছায়। কাজেই আমরা মোটামুটিভাবে পানির তরঙ্গ বা পানির ঢেউ কীভাবে জন্ম নেয় এবং কী গতিতে পৌছায় সেটা খানিকটা অনুমান করতে পারি।

যারা এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে বা শুয়ে শুয়ে এই বইটা পড়ছে, আমি তাদের বলব এখন উঠে বসে 1 নম্বর ছবিটা ভালো করে দেখতে। এখানে একটা চলমান তরঙ্গের ছবি এক সেকেন্ডে পরে পরে নেওয়া হলে কেমন দেখাবে সেটা দেখানো হয়েছে। প্রথম ছবিটা (1a) দেখানো হয়েছে $t = 0$ সময়ের জন্যে। তরঙ্গটার বাম দিকে তরঙ্গের সবচেয়ে উঁচু অংশটাতে আমরা একটা ছোট তীরে দিয়ে অবস্থানটা নির্দিষ্ট করেছি। এর নিচের ছবিটি (1b) এক সেকেন্ড পরের ছবি—আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট তীর দিয়ে নির্দিষ্ট অংশটুকু একটু ডান দিকে সরে গেছে।

ছোট একটা তীর দিয়ে তরঙ্গের সবচেয়ে উঁচু অংশটা চার সেকেন্ডে (1a থেকে শুরু করে 1e পর্যন্ত) গিয়েছে 1m, কাজেই এই তরঙ্গটার গতিবেগ হচ্ছে :

$$v = \frac{1m}{4s} = 0.25 m/s$$

ছবিটাতে আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave Length) বলতে কী বোঝাই সেটাও দেখানো হয়েছে, তরঙ্গের একটা উঁচু জায়গা বা সর্বোচ্চ বিস্তার (amplitude) থেকে পরের উঁচু জায়গা সর্বোচ্চ বিস্তার হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, আমরা আমাদের ছবি থেকে বলতে পারি সেটা হচ্ছে :

$$\lambda = 4.5m - 2.5m = 2m$$

একটা তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবসময় নির্দিষ্ট থাকে, একটা বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আস্তে আস্তে ছোট তরঙ্গ দৈঘ্য হয়ে যেতে পারে না, কিংবা একটা ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আস্তে আস্তে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয়ে যেতে পারে না। আমরা ছবিতে তরঙ্গের পাশাপাশি দুটি সবচেয়ে বড় অংশের ভেতরকার দূরত্ব থেকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করেছি। আমরা ইচ্ছে করলে পাশাপাশি সবচেয়ে নিচু অংশের দূরত্ব থেকেও (1b) সেটা বের করতে পারতাম। পাশাপাশি যেখানে তরঙ্গের উচ্চতা শূন্য বা বিস্তার সেখান থেকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে হলে একটু সতর্ক হতে হবে। ছবির 1c তে পাশাপাশি দুটো শূন্য উচ্চতা P এবং Q দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই দুটোর মাঝে দূরত্বটি পুরো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নয়, তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। যদিও দুই জায়গাতেই তরঙ্গের উচ্চতা শূন্য, কিন্তু তারা তরঙ্গের একই অবস্থান (Phase বা দশা) নয়। P

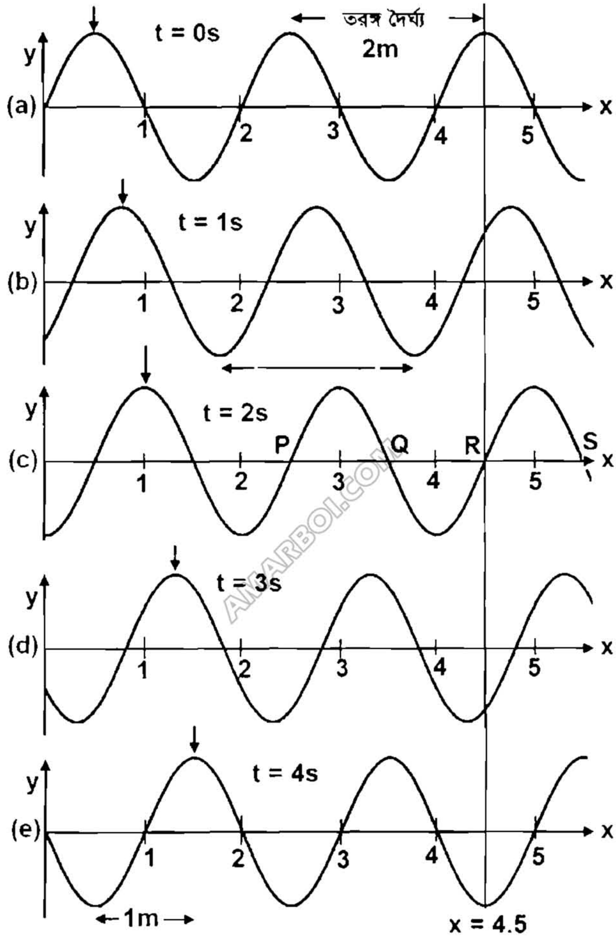

1 নং ছবি: একটি চলমান তরঙ্গের ছবি 1s পরপর নেওয়া হলে যেমন দেখাবে।

বিন্দুতে তরঙ্গটা বড় হবার সময় শূন্য উচ্চতায় ছিল, Q বিন্দুতে তরঙ্গটা ছোট হবার সময় শূন্য উচ্চতার ভেতর দিয়ে গিয়েছে। কাজেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করার সময় P থেকে R বিন্দুর দূরত্বটুকু মাপতে হবে। কারণ এই দুটি বিন্দুতেই তরঙ্গের অবস্থান (Phase বা দশা) একরকম—বড় হবার সময় শূন্য উচ্চতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেরকম আমরা ইচ্ছে করলে Q এবং S-এর ভেতরকার দূরত্বটুকু মেপে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপতে পারতাম। কারণ এ-দুটি বিন্দুতেও তরঙ্গের উচ্চতা শূন্য এবং তরঙ্গটি ছোট হবার সময় শূন্য উচ্চতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

আমরা আগেই বলেছি 1 নং ছবিটিতে বিভিন্ন সময়ে একটা তরঙ্গের ছবি দেখানো হয়েছে। আমরা যদি $t = 0$ সময়ে বিভিন্ন অবস্থানে, অর্থাৎ x-এর বিভিন্ন মানে তরঙ্গটি দেখি তাহলে দেখব তরঙ্গটা বড় থেকে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এটার মান নেগেটিভ হয়ে সর্বনিম্নে পৌছে আবার ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে এবং বারবার একই ব্যাপার ঘটে চলছে।

ঠিক একইভাবে আমরা যদি x-এর কোনো নির্দিষ্ট মানে বিভিন্ন সময়ে তরঙ্গের উচ্চতাটুকু দেখি তাহলে একই ব্যাপার দেখব। ছবিতে $x = 4.5$m অবস্থানে $t = 0$ সময়ে (1a) তরঙ্গটি ছিল সবচেয়ে উঁচু, $t = 1$s এ তরঙ্গের উচ্চতাটুকু আরেকটু কমেছে $t = 2$s এ উচ্চতাটুকু শূন্যে নেমে গেছে 3s এ উচ্চতাটুকু 0 থেকেও কম অর্থাৎ নেগেটিভ উচ্চতায় পৌছেছে এবং 4s এ সর্বনিম্ন উচ্চতায় পৌছেছে। আমরা বলতে পারি, যদি আরও 4s আমরা এই তরঙ্গের উচ্চতাটুকু পরীক্ষা করে দেখতাম তাহলে আমরা দেখতাম এটা $t = 0$ এর সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌছে যেত। যে সময় পরে পরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা তরঙ্গ তার একই অবস্থান (বা দশায়) পৌছায় তাকে বলে কম্পন কাল Time Period। আমাদের এই তরঙ্গের কম্পন কাল :

$$T = 4s$$

আমরা মোটামুটিভাবে তরঙ্গের সাথে সম্পর্ক আছে সেরকম সব সংজ্ঞাই বলে ফেলেছি, শুধুমাত্র একটা বাকি রয়েছে। সেটা হচ্ছে তরঙ্গের কম্পন (Frequency)। প্রতি সেকেন্ডে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কতবার একই অবস্থানে (অথবা দশায়) ফিরে ফিরে আসে সেটাই হচ্ছে কম্পন। আমাদের ছবিতে আমরা দেখছি চার সেকেন্ডে অর্ধেক কম্পন হয়েছে, পুরো আট সেকেন্ডে একটা কম্পন পুরো হতো। কাজেই এর কম্পন হচ্ছে :

$$\nu = \frac{1}{8}s^{-1}$$

$$\text{কিংবা } \nu = \frac{1}{8}\,\text{Hz}$$

কম্পনকে যে-ইউনিট দিয়ে প্রকাশ করা হয় তার ইউনিট হচ্ছে হার্টজ (Hertz)।

1 নং ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকলেই আমরা বুঝতে পারব একটা তরঙ্গের গতিবেগের সাথে তার কম্পন এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা সম্পর্ক আছে। কম্পন দিয়ে আমরা পাই প্রতি সেকেন্ডে তরঙ্গটি কতবার একই অবস্থানে ফিরে এসেছে। একই অবস্থান থেকে পরের একই অবস্থান হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য—কাজেই আমরা বলতে পারি, এক সেকেন্ডে একটা তরঙ্গের নির্দিষ্ট অবস্থানের সরে যাওয়া দূরত্ব S হচ্ছে :

$$S = \text{কম্পন} \times \text{তরঙ্গের দৈর্ঘ্য}$$

কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে সরে যাওয়া দূরত্বই হচ্ছে বেগ। কাজেই বেগ v হচ্ছে

$$v = \nu\lambda$$

আমাদের উদাহরণে কম্পন ν হচ্ছে $\frac{1}{8}$Hz কিংবা $\frac{1}{8}s^{-1}$ এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ হচ্ছে 2m, কাজেই বেগ v হচ্ছে :

$$v = \frac{1}{8}\,s^{-1} \times 2\text{m} = 0.25\ \text{m/s}$$

ঠিক ছবি থেকে আগে যেটা আমরা পেয়েছিলাম।

আমাদের উদাহরণের বেগ এবং কম্পন দুটোই বেশ কম। আমরা আগেই বলেছি, আলো হচ্ছে একটা তরঙ্গ এবং তার বেগ c হচ্ছে সেকেন্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার বা

$$c = 3 \times 10^{8}\ \text{m/s}$$

কাজেই আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি, আলোর কম্পন কত। মজার কথা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু চট করে দেওয়া যাবে না—এটা দেবার আগে অন্য একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে হবে। সেটা হচ্ছে কোন আলোর কম্পন? তার কারণ লাল আলোর কম্পন একরকম, সবুজ আলোর কম্পন অন্যরকম, আবার বেগুনি আলোর কম্পন অন্যরকম। কাজেই লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক রকম, সবুজ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অন্যরকম, বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আবার অন্যরকম।

আমাদের দৃশ্যমান আলোর মাঝে সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে লাল আলোর। সেটা হচ্ছে আনুমানিকভাবে :

$$\lambda_{RED} = 650 \text{ nm বা}, 6.5 \times 10^{-7}\text{m } (1\text{nm} = 10^{-9}\text{m})$$

10^{-7} হচ্ছে এক কোটি ভাগের এক ভাগ। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে যদিও বলা হচ্ছে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেটা আসলে খুবই ছোট!

যেহেতু আমরা আলোর বেগ জানি এবং সেটা লাল সবুজ বেগুনি সব আলোর জন্যই সমান তাই আমরা লাল আলোর কম্পন বের করতে পারি। সেটা হচ্ছে :

$$f_{RED} = \frac{c}{\lambda_{RED}} = \frac{3 \times 10^{8}\text{m/s}}{6.5 \times 10^{-7}\text{m}} = 4.6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

দেখাই যাচ্ছে এটা বিশাল, কোটি কোটি বার 4.6!

বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোট, সেটা হচ্ছে :

$$\lambda_{VIOLET} = 450 \text{ nm বা } 4.5 \times 10^{-7}\text{m}$$

সবুজ হচ্ছে লাল এবং বেগুনির মাঝামাঝি। অর্থাৎ

$$\lambda_{GREEN} = 550 \text{ nm বা}, 5.5 \times 10^{-7}\text{m}$$

আগের বারের মতো আমরা তাদের কম্পনও বের করতে পারি এবং আমাদের পরিচিত সব আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং কম্পন বের করে । নং তালিকায় দেখানো হলো :

1 নং তালিকা

	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (nm)	কম্পন (Hz)
লাল	650	4.6×10^{14}
কমলা	625	4.8×10^{14}
হলুদ	575	5.2×10^{14}
সবুজ	550	5.5×10^{14}
নীল	475	6.3×10^{14}
বেগুনি	450	6.7×10^{14}

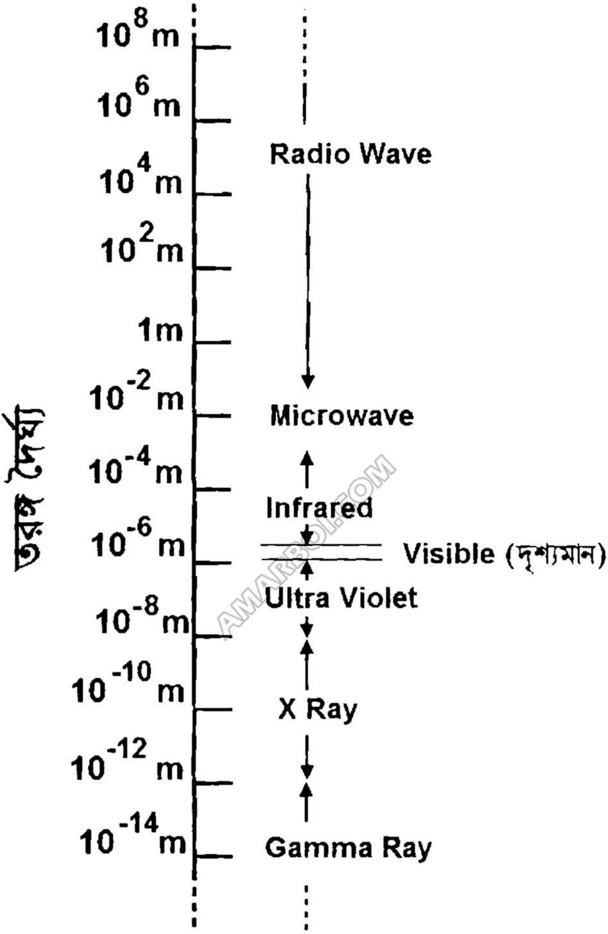

2 নং ছবি : বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নাম

এখানে আরেকটা ব্যাপার বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি 650nm থেকে বেশি কিংবা 450nm থেকে কম হয় তখন সেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না। সাধারণভাবে আমরা যেটাকে দেখতে পাই সেটাকেই আলো বলি। কাজেই যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 650nm থেকে বেশি বা 450nm থেকে কম সেটাকে সাধারণভাবে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ (Electro Magnetic Wave) বলা হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে তার বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কী নাম সেটা 2নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। যারা এই বিষয়টি জানত না, তাদের কাছে ব্যাপারটা বেশ মজার মনে হতে পারে বলে আমার ধারণা। রেডিওতে অনুষ্ঠান শোনার জন্য যে-তরঙ্গ পাঠানো হয় এবং যে-আলো আমরা দেখি এবং শরীরের হাত ভেঙে গেলে যে-এক্সরে দিয়ে তার ছবি তোলা হয় তার সবই আসলে একই তরঙ্গ—তাদের পার্থক্য হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের।

এই বেলা আরও একটা জিনিস বলে দেওয়া যায় যদিও তার গুরুত্বটা এখন চট করে বোঝা যাবে না—সেটা হচ্ছে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কমে (অর্থাৎ কম্পন যত বাড়ে) তার শক্তি তত বাড়ে। সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গামা রের এবং তার শক্তি সবচেয়ে বেশি। মাঝে মহাকাশ থেকে প্রচণ্ড শাক্তিশালী গামা রে এসে আমাদের পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে দেয়। সাধারণ আলো কখনোই সেটা পারে না।

3. তরঙ্গের গণিত

1 নং ছবিতে একই তরঙ্গের ছবি এক সেকেন্ড পরে পরে নেওয়া হয়েছে। আমরা কি কোনোভাবে এই তরঙ্গের একটা গাণিতিক রূপ দিতে পারি? কাজটা আসলে খুবই সহজ, যারা একটুআধটু ত্রিকোণোমিতি পড়তে শুরু করেছে তারা নিশ্চয়ই 1নং ছবি দেখে মাথা নেড়ে আগেই বলেছ, তরঙ্গটা দেখতে হুবহু Sin θ-এর মতো। যেখানে θ, x-এর দিকে বেড়ে গেছে। আসলেও তা-ই, আমরা এই চলমান তরঙ্গটিকে sin θ দিয়ে লিখতে পারি, সেখানে θ এর জায়গায় অন্য কিছু লিখতে হবে। সাধারণভাবে চলমান তরঙ্গের রূপটা এরকম :

$$y\,(x,\,t) = y_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right]$$

এখানে y_0 হচ্ছে তরঙ্গের সবচেয়ে বেশি উচ্চতা বা সর্বোচ্চ বিস্তার। λ, x, v এবং t বলতে কী বোঝানো হয় আমরা সেটা আগেই বলেছি তাই নূতন করে আর বলার প্রয়োজন নেই। এবারে 1 নং ছবির তরঙ্গে দেখানো λ এবং v-এর মান বসিয়ে দিলে আমরা পাব :

$$y\,(x,\,t) = y_0 \sin\left[\pi(x - 0.25t)\right]$$

1 নং ছবির প্রথম তরঙ্গটিতে t-এর মান শূন্য। কাজেই তার জন্যে তরঙ্গটা খুবই সহজ :

$$y\,(x, 0) = y_0 \sin [(\pi x)]$$

আমরা সবাই জানি, π রেডিয়ান হচ্ছে $180°$ কাজেই

যখন $x = 0$ তখন $y\,(0, 0) = y_0 \sin 0 = 0$

যখন $x = 0.5$ তখন $y\,(0.5,0) = y_0 \sin\frac{\pi}{2} = y_0$

যখন $x = 1.0$ তখন $y\,(1,0) = y_0 \sin\pi = 0$

যখন $x = 1.5$ তখন $y\,(1.5,0) = y_0 \sin\frac{3\pi}{2} = -y_0$ ইত্যাদি

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, $t = 0$ সময়ে x-এর বিভিন্ন মানের জন্যে তরঙ্গের বিস্তার যতটুকু হওয়া উচিত আমরা ঠিক ততটুকুই পাচ্ছি, যার অর্থ আমরা সঠিকভাবেই তরঙ্গের গাণিতিক রূপটা ব্যবহার করছি। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমরা এক সেকেন্ডে কী রূপ হবে সেটাও বিবেচনা করতে পারি :

$$y\,(x, 1) = y_0 \sin(\pi x - 0.25\pi)$$

আগেরকার আমরা $x = 0, 0.5, 1.0$ এবং 1.5-এর জন্যে তরঙ্গীয় বিস্তার বের করেছিলাম। এবারে বের করা যাক $x = 0.25, 0\text{-}.75, 1.25$ এবং 1.75-এর জন্য।

যখন $x = 0.25$ তখন :

$y(0.25, 1) = y_0 \sin (0.25\pi - 0.25\pi) = 0$

যখন $x = 0.75$ তখন :

$$y(0.75, 1) = y_0 \sin [0.75 - 0.25)\pi] = y_0 \sin\frac{\pi}{2} = y_0$$

যখন $x = 1.25$ তখন :

$$y(1.25, 1) = y_0 \sin [(1.25 - 0.25)\pi] = y_0 \sin\pi = 0$$

যখন $x = 1.75$ তখন :

$$y(1.75, 1) = y_0 \sin [(1.75 - 0.25)\pi] = y_0 \sin\frac{3\pi}{2} = - y_0$$

দেখাই যাচ্ছে এবারেও আমরা প্রতিবারই সঠিক মান পেয়ে যাচ্ছি। কারও যদি সন্দেহ থাকে তাহলে সে t-এর যে-কোনো মানের জন্যে তরঙ্গের বিস্তার বের করে দেখতে পারে।

কাজেই আমার মনে হয় এই বিষয়টা মনে রাখা খারাপ নয়, λ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা তরঙ্গ যদি x-এর দিকে v বেগে ছুটে যেতে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা লিখতে পারি :

$$y(x, t) = y_0 \sin [\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)]$$

আমার মনে হয়, কেন এই রূপটা একটা চলমান তরঙ্গ সেটা একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। x - vt-এর একটা নির্দিষ্ট মানের জন্যে তরঙ্গের একটা নির্দিষ্ট বিস্তার বা উচ্চতা থাকে। আমরা যদি একটা চলমান তরঙ্গের সেই নির্দিষ্ট উচ্চতার দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে দেখব সেটা ছুটে যাচ্ছে। অর্থাৎ একটু পরে সেই নির্দিষ্ট উচ্চতার তরঙ্গটা নতুন একটা x-এ উপস্থিত হয়েছে—অর্থাৎ x-এর মানটা বেড়ে হয়েছে x + Δx, ঠিক সেরকম যেহেতু এর মাঝে একটু সময় পার হয়ে গেছে তাই t-এর মানটুকুও বেড়ে গিয়ে হয়েছে t + Δt। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে হতে হবে যেন তরঙ্গের উচ্চতাটুকু আগের মতোই থাকে। অর্থাৎ x - vt এর মান অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ

$$x - vt = (x + \Delta x) - v(t + \Delta t)$$

$$x - vt = (x - vt) + \Delta x - v\Delta t$$

$$\text{কিংবা } v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

অর্থাৎ তরঙ্গটা Δt সময়ে Δx দূরত্ব অতিক্রম করছে v বেগে।

যারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে তাদেরকে এবারে অন্য একটা প্রশ্ন করা যায়। তরঙ্গটা যদি উল্টোদিকে যেত তাহলে তার রূপটা কেমন হতো? এবারে t-এর মান যত বাড়তে থাকবে x-এর মান তত কমতে হবে, কাজেই উত্তরটা সহজ :

$$y(x, t) = y_0 \sin [\frac{2\pi}{\lambda}(x + vt)]$$

আমরা যেহেতু x দিকে চলমান একটা তরঙ্গ এবং তার উল্টোদিকে চলমান একটা তরঙ্গের রূপ পেয়ে গেছি তখন এই দুটো রূপ ব্যবহার করে নতুন একটা

কাজ করার লোভ সামলাতে পারছি না। ধরা যাক কোনো-একটা মাধ্যমের দুই পাশ থেকে দুটো তরঙ্গ তৈরি করে ছেড়ে দেওয়া হলো। 3 নং ছবিতে দেখানো উপায়ে বাম দিক থেকে একটা তরঙ্গ তৈরি করে ডানদিকে পাঠানো হলো। ঠিক একই সময়ে বাম দিকে একটা তরঙ্গ তৈরি করে ডান দিকে পাঠানো হলো। একটা তরঙ্গ যখন অন্য একটা তরঙ্গের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে তখন কী হবে?

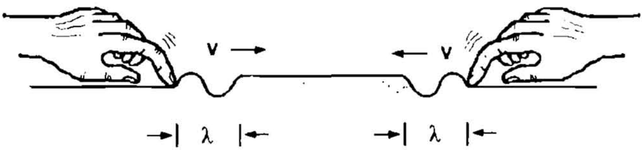

3 নং ছবি : বাম দিকে λ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা তরঙ্গের জন্ম দেওয়া হয়েছে (y_1) যেটা ডান দিকে v গতিতে যাচ্ছে ঠিক সেরকম ডান দিকে একটা তরঙ্গের জন্ম দেওয়া হয়েছে (y_2) যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ এবং যেটা বাম দিকে যাচ্ছে। যখন একটা তরঙ্গ আরেকটা তরঙ্গের ভেতর দিয়ে যাবে তখন সেই তরঙ্গটি (y) হবে দুটি তরঙ্গের যোগফল, $y = y_1 + y_2$

আমরা যেহেতু সূত্রগুলো জানি তাই প্রথমে কোনোকিছু না ভেবে সরাসরি সূত্রগুলো ব্যবহার করে দেখি কী হয়। ধরা যাক তরঙ্গ দুটো হচ্ছে y_1 এবং y_2

অর্থাৎ :

$$y_1 = y_0 \sin [\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)]$$

এবং $$y_2 = y_0 \sin [\frac{2\pi}{\lambda}(x + vt)]$$

কাজেই দুটো তরঙ্গ একই সময়ে একই জায়গায় উপস্থিত হলে সেটা হবে :

$$y = y_1 + y_2 = y_0\sin [\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)] + y_0\sin [\frac{2\pi}{\lambda}(x + vt)]$$

এবারে আমরা একটু ত্রিকোণোমিতি ব্যবহার করি। আমরা জানি,

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\sin (x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

এবং $\sin (x + y) + \sin(x - y) = 2 \sin x \cos y$

কাজেই আমরা লিখতে পারি :

$$y = 2y_0 \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)\cos\left(\frac{2\pi vt}{\lambda}\right)$$

আগেরবার আমরা তরঙ্গের ছবিটা এঁকেছি প্রথমে তারপর তার গাণিতিক রূপটা বলেছি। এবারে আমরা উল্টো কাজ করছি। প্রথমে একটা গাণিতিক রূপ পেয়েছি এবং তারপর তার ছবিটা আঁকতে যাচ্ছি। 1 নং ছবিতে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ($\lambda = 2$) এবং বেগ ($v = 0.25$) ব্যবহার করা হয়েছে এখানেও সেটাই ব্যবহার করা যাক, তাহলে আমরা পাব :

$$y = 2y_0 \sin (\pi x) \cos (0.25\,\pi t)$$

এই তরঙ্গের ছবিটা 4 নং ছবিতে আঁকা হয়েছে। ছবিতে $t = 0$ সময় থেকে শুরু করে 1s পরপর $t = 4s$ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। ছবিটা ভালো করে লক্ষ করো, এটা কিন্তু চলমান তরঙ্গ নয়। এটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ডানদিকেও যাচ্ছে না, বাম দিকেও যাচ্ছে না। এই তরঙ্গটা এক জায়গায় স্থির (Standing Wave)। আমরা যদি কোনো-একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ($x = 0.5$) তাকাই তাহলে দেখব এটা তার সর্বোচ্চ বিস্তার বা উচ্চতা $y = 2y_0$ থেকে শুরু করে ($t = 0$) ধীরে ধীরে কমে এসেছে। যখন $t = 2$ তখন তরঙ্গটির উচ্চতা সব জায়গায় শূন্য, কেউ দেখলে বুঝতেও পারবে না—এর মাঝে একটা তরঙ্গ লুকিয়ে আছে। পরের সেকেন্ডে এটা আরও নিচের দিকে যেতে শুরু করেছে। $t = 4s$ এ তরঙ্গের এই জায়গাটার উচ্চতা বা বিস্তার সবচেয়ে নিচে এসে পৌঁছেছে ($y = -2y_0$)। এর পরে আর এঁকে দেখানো হয়নি, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে তরঙ্গটার উচ্চতা সবচেয়ে নিচে থেকে আবার উপরে উঠতে শুরু করবে, যখন $t = 6s$ তখন আবার পুরো তরঙ্গের উচ্চতা সব জায়গায় শূন্য, যখন $t = 8s$ হবে তখন তরঙ্গের উচ্চতা আবার $t = 0$-তে দেখানো অবস্থায় এসে যাবে। সময় পার হওয়ার সাথে সাথে এটা বারবার ঘটতে থাকবে।

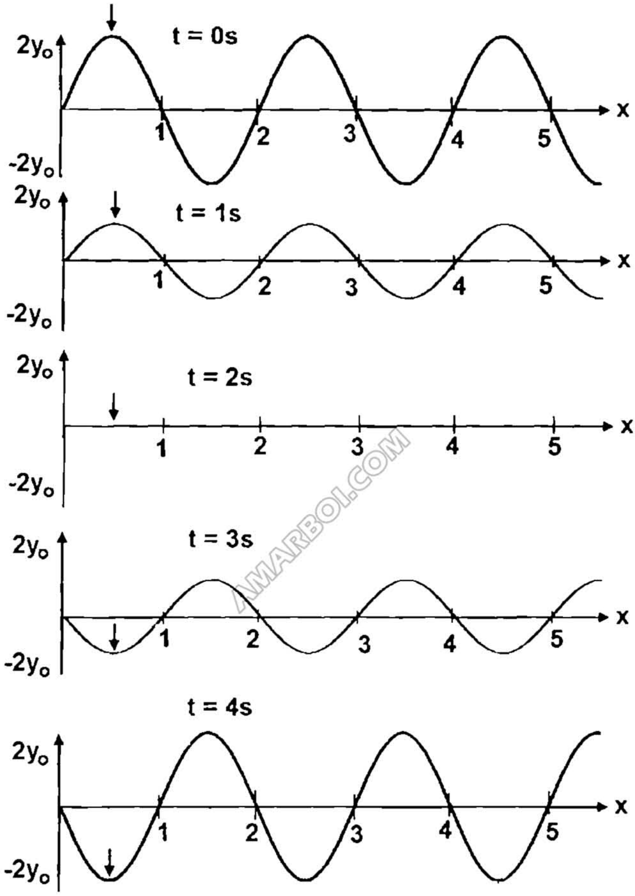

4 নং ছবি : বিপরীত দিকে যাওয়া দুটি তরঙ্গের যোগফল।

কেউ যেন মনে না করে এটা শুধুমাত্র গাণিতের চর্চা, এটা বাস্তব জীবনে অহরহ ঘটছে। কেউ যখন গিটার, সেতার বা একতারার তারে টোকা দেয় তখন সেখানে যে স্থির তরঙ্গের সৃষ্টি হয় সেটাই গিটার, সেতার বা একতারার সেই মধুর শব্দের জন্ম দেয়। তোমরা প্রশ্ন করতে পার সেখানে বিপরীত দিকে যাওয়া দুটি তরঙ্গ কোথা থেকে এসেছে? আসলে তারের মাঝে যে-তরঙ্গের জন্ম হয় সেটা শেষ মাথায় গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে বলে তারের মাঝে দুটি বিপরীতমুখী তরঙ্গের জন্ম হয়।

এই বিষয়টা সবচেয়ে সুন্দরভাবে দেখা যায় যদি একটা টিউনিং ফর্ক থাকে, টিউনিং ফর্ক থেকে নিখুঁতভাবে সুনির্দিষ্ট কম্পন তৈরি করা যায়। ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে একটা সুতোর একপাশে টিউনিং ফর্ক অন্যপাশে খানিকটা ওজন ঝুলিয়ে টিউনিং ফর্কের মাঝে কম্পন তৈরি করলেই সুতার মাঝে স্থির তরঙ্গের জন্ম হয়। সুতার সাথে ঝোলানো ওজনটুকু বাড়িয়ে বা কমিয়ে স্থির তরঙ্গের সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যায় (5 নং ছবি)।

তরঙ্গের গাণিতিক রূপটা লিখে যে অনেক কিছুই বলা হয়েছে—সবকিছু ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই—শুধু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে—যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে যদি কোনো-একটা বিন্দুতে দুটি তরঙ্গ এসে উপস্থিত হয় তাহলে সেই বিন্দুতে যে নতুন তরঙ্গের জন্ম হয় সেটা হচ্ছে দুটি ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গের যোগফল। অর্থাৎ $y = y_1 + y_2$।

আমি নিশ্চিত অনেকেই ভাবছে এটা আর এমন কী? কিন্তু দেখা যাবে এটা দিয়েই আমরা অ-নে-ক কিছু করে ফেলব।

4. তরঙ্গের প্রতিফলন

তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়—যারা তাদের চোখ কান খোলা রাখে তারা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা এর মাঝে লক্ষ করেছে। তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় বলে আমরা আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখতে পারি (আমাদের মুখ থেকে আলো আয়নায় গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে)। চায়ের কাপ বা দুধের গ্লাসে চুমুক দেওয়ার আগে আমরা যদি সেটাকে টেবিলে স্থির করে রাখি, তারপর সাবধানে সেটাকে হাত বা চামুচ দিয়ে স্পর্শ করি তাহলে দেখব সেখানে একটা তরঙ্গের জন্ম হয়েছে, সেই তরঙ্গটা কাপ বা গ্লাসের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার মাঝখানে ফিরে আসছে। আমরা জানি শব্দ এক ধরনের তরঙ্গ। একটা বড় দালানের সামনে

নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে জোরে একটা শব্দ করলে আমরা পরিষ্কার তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। প্রতিধ্বনিটা আর কিছুই নয়, শব্দ নামক তরঙ্গের প্রতিফলন।

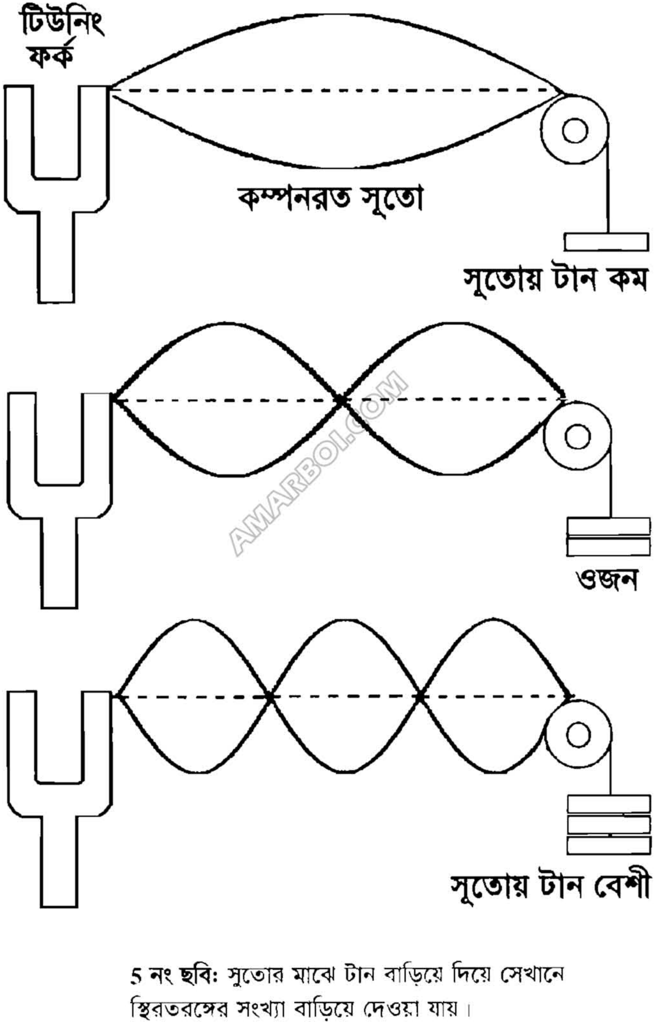

5 নং ছবি: সুতোর মাঝে টান বাড়িয়ে দিয়ে সেখানে স্থিরতরঙ্গের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

তরঙ্গের প্রতিফলনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে যেটা আমাদের জানা দরকার। বিষয়টা বোঝানোর জন্যে আমরা মোটা একটা দড়িতে 6 নং ছবির মতো করে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারি। দড়িটার একপাশে তুমি ধরে রেখেছ অন্যপাশে শক্ত করে বাঁধা। এবারে তুমি যেখানে ধরে রেখেছ সেখানে উপর নিচে ঝাঁকুনি দিয়ে তুমি একটা তরঙ্গ তৈরি করতে পারবে। যদি সত্যি সত্যি তুমি এটা করো তাহলে তুমি তরঙ্গটাকে যেতে দেখবে, যেখানে শক্ত করে বাঁধা আছে সেখানে পৌঁছাতে দেখবে এবং সেটাকে প্রতিফলিত হয়ে আবার তোমার দিকে ফিরে আসতে দেখবে। যদি ভালো করে তাকিয়ে দেখো তাহলে একটা মজার বিষয় দেখতে পাবে, দেখবে প্রতিফলিত তরঙ্গটা উল্টো হয়ে তোমার কাছে ফিরে এসেছে।

কেন সেটা ঘটছে সেটা বোঝা এমন কিছু কঠিন নয়। দড়ির ভেতর তুমি যে তরঙ্গটা সৃষ্টি করেছ সেটা যখন শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে তখন সেটা দড়ির বাঁধনের অংশে ওপরের দিকে টেনেছে, নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলে, কোনোকিছুতে বল প্রয়োগ করলে সেটাও পাল্টা বল প্রয়োগ করে। কাজেই দড়ির বাঁধনটা দড়িটাকে টেনেছে নিচের দিকে। সেই টানটাই প্রতিফলনটা তৈরি করেছে, কাজেই প্রতিফলনের সেই তরঙ্গটা তৈরি হয়েছে আসল তরঙ্গের ঠিক উল্টো দিকে। যারা তরঙ্গ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তারা অসংখ্যবার এই বিষয়টা দেখতে পাবে, এবং সেটা হচ্ছে প্রতিফলনে তরঙ্গের বিস্তারটা উল্টে যায়।

আমরা যেহেতু চলমান তরঙ্গের একটা গাণিতিক রূপ লিখেছি তাই গণিতের ভাষায় বলতে পারি তরঙ্গের মাঝে একটা বাড়তি π রেডিয়ান ঢুকে আছে। অর্থাৎ মূল তরঙ্গটি যদি হয় :

$$y_1 = y_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right]$$

প্রতিফলিত তরঙ্গটি যেহেতু উল্টোদিকে যাচ্ছে তাই দশা (বা phase) $\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)$ হবে না $\frac{2\pi}{\lambda}(x + vt)$ এবং থাকবে বাড়তি একটা π :

$$y_2 = y_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x + vt) + \pi\right]$$

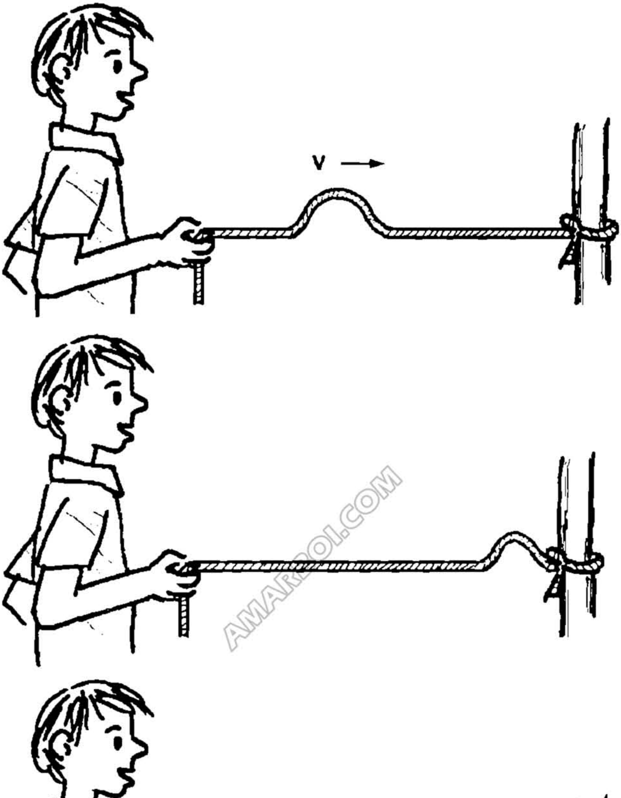

৬ নং ছবি: দড়ির একপ্রান্ত শক্ত করে বেঁধে সেখানে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি করলে সেটি উল্টো হয়ে প্রতিফলিত হবে।

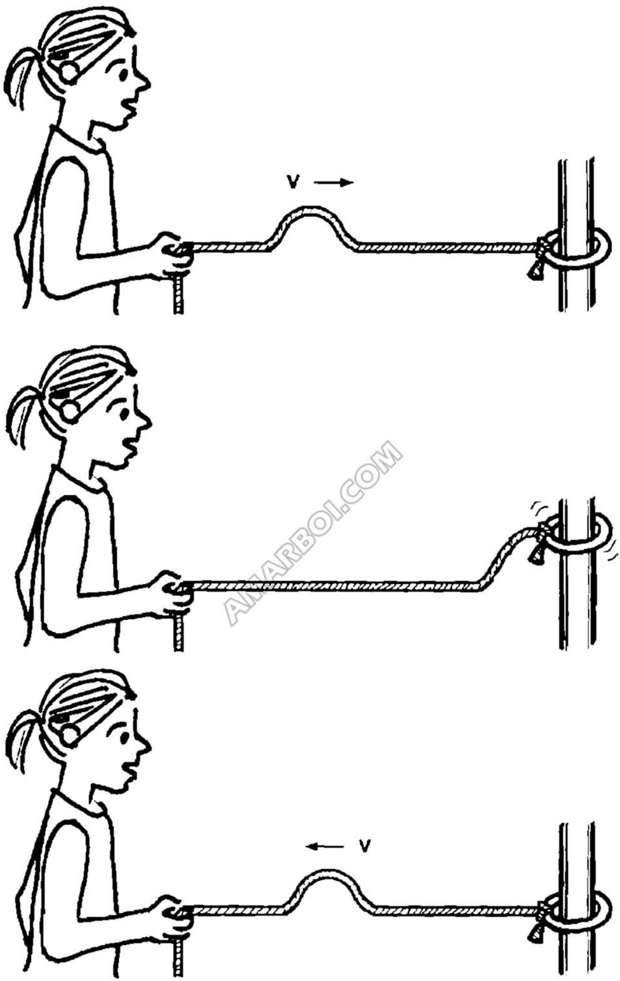

7 নং ছবি: দড়ির এক প্রান্ত মুক্ত রেখে অন্য প্রান্ত থেকে একটা তরঙ্গ পাঠালে সেটা সোজাভাবে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে।

এবারে আমরা একটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করতে পারি—দড়ির একপ্রান্ত যদি শক্ত করে বাঁধা না থেকে মুক্ত থাকত তাহলে কী হতো? 7 নং ছবির মতো, যেখানে দড়ির প্রান্তটি একটা রিংয়ের সাথে বাঁধা এবং সেই রিংটি খুব সহজেই উপরে নিচে যেতে পারে?

বোঝাই যাচ্ছে এবারে নিউটনের তৃতীয় সূত্র দড়িটাকে টানতে পারছে না। দড়িটাতে যে-তরঙ্গ তৈরি করা হয়েছে সেটাই বরং রিংটাকে টেনে সহজেই উপরে নিয়ে যাচ্ছে, কাজেই প্রতিফলিত তরঙ্গটা আবার একইভাবে ফিরে আসবে, আগের বারের মতো উল্টে যাবে না।

আমরা যেহেতু চলমান তরঙ্গের একটা গাণিতিক রূপ তৈরি করে রেখেছি, আবার সেটা ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ মূল তরঙ্গটি যদি হয় :

$$y_1 = y_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right]$$

তাহলে প্রতিফলিত তরঙ্গটি হবে

$$y_2 = y_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x + vt)\right]$$

অর্থাৎ তরঙ্গের দশা (বা Phase) $\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)$ -এর পরিবর্তে $\frac{2\pi}{\lambda}(x + vt)$ কিন্তু কোনো বাড়তি π নেই।

উপরের দুটি উদাহরণ থেকে আমরা যেটা শিখেছি সেটাকে সাধারণভাবে বলতে পারি : একটা তরঙ্গ যদি হালকা মাধ্যম থেকে ঘনমাধ্যমে যাবার সময় প্রতিফলিত হয় তাহলে সেটা উল্টে যায় বা দশাতে π পরিবর্তন হয়। তরঙ্গটা যদি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় তাহলে প্রতিফলিত তরঙ্গের আকার পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ দশাতে বাড়তি π ঢুকে যায় না।

বিষয়টা ৪ নং ছবিতে আরও ভালো করে দেখানো হয়েছে। একটা সরু দড়ি আর একটা মোটা দড়ি বেঁধে সরু দড়ি দিয়ে একটা তরঙ্গ পাঠানো হচ্ছে। এবারে তরঙ্গ শুধু প্রতিফলিত হবে না, খানিকটা প্রতিসারিতও হবে। প্রতিফলিত তরঙ্গটা উল্টে যাবে, প্রতিসারিত তরঙ্গটা অবিকৃত থাকবে।

ঠিক সেরকম একটা মোটা দড়ি আর একটা সরু দড়ি বেঁধে মোটা দড়ি দিয়ে একটা তরঙ্গ পাঠানো হচ্ছে। এবারে তরঙ্গটা অবিকৃতভাবে প্রতিফলিত হবে এবং অবিকৃতভাবে প্রতিসারিত হবে।

বিষয়টা যে শুধু দড়ির বেলায় সত্যি তা নয়, সবক্ষেত্রেই সত্যি। বাতাস হচ্ছে হালকা মাধ্যম, কাচ ঘন মাধ্যম। বাতাস থেকে কাচে ঢোকার সময় যে-আলোর

তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় সেটা উল্টো হয়ে যায়। আবার কাচ থেকে বাতাসে আলো যাবার সময় প্রতিফলিত আলোর তরঙ্গ অবিকৃত থাকে ঠিক 9 নং ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে।

ব্যাপারটা মনে রাখা ভালো, একটু পরেই এই তথ্যটা ব্যবহার করে আমরা কিছু চমকপ্রদ বিষয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

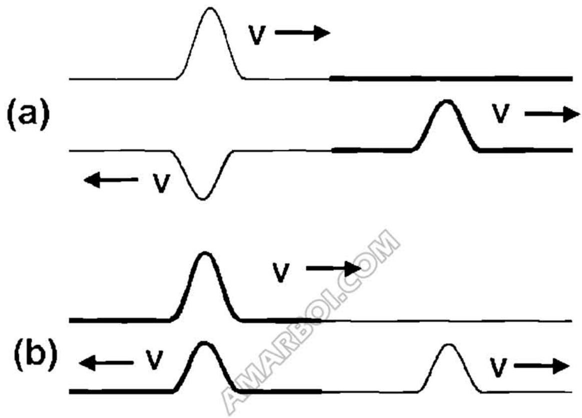

৪ নং ছবি : (a) হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যাবার সময় তরঙ্গটি উল্টো হয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। (b) ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় তরঙ্গটি অবিকৃতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

5. তরঙ্গের যোগবিয়োগ

আমরা এই ব্যাপারটি এর মাঝে একবার করে ফেলেছি। যখন বিপরীত দিক থেকে দুটি তরঙ্গ আসছিল তখন আমরা সেই দুটি তরঙ্গ যোগ দিয়ে দেখিয়েছিলাম যে বিপরীত দিক থেকে আসা দুটি তরঙ্গ যোগ দিলে আসলে একটা স্থির তরঙ্গ তৈরি হয়। গিটার বা সেতারের তারে সেটা তৈরি করে আমরা মধুর সুরের জন্ম দিই।

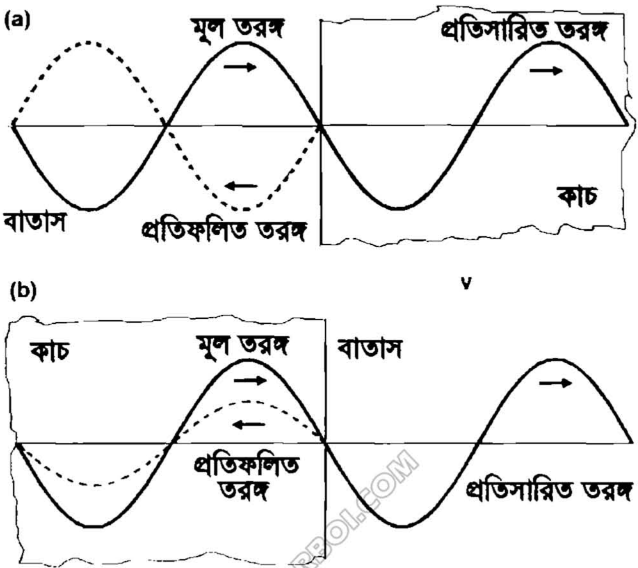

9 নং ছবি: (a) বাতাস থেকে কাচে যাবার সময় প্রতিফলিত আলোর তরঙ্গ উল্টে যায়। (b) কাচ থেকে বাতাসে যাবার সময় প্রতিফলিত আলোর তরঙ্গ অবিকৃত থাকে।

যে-বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে তরঙ্গকে যোগ বা বিয়োগ করা যায়। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে যদি চারিদিক থেকে নানা ধরনের তরঙ্গ আসতে থাকে তাহলে সেই বিন্দুতে তরঙ্গের উচ্চতা বা বিস্তার হবে সবগুলো তরঙ্গের যোগফল। অনেকগুলো তরঙ্গ না ধরে বিষয়টা সহজ করে বোঝার জন্যে আমরা দুটো তরঙ্গের কথা বিবেচনা করি। 10 নং ছবিতে এরকম দুটি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দুটি তরঙ্গ একই সময় হাজির হয়েছে। তরঙ্গগুলোর ঠিক মাঝখান দিয়ে যে-সরলরেখাটা টানা হয়েছে সেটা হচ্ছে তরঙ্গের মাধ্যমটির স্থির অবস্থা অর্থাৎ যখন কোনো তরঙ্গ এখানে আসেনি তখনকার অবস্থাটা। প্রথম তরঙ্গটা আসার কারণে মাধ্যমের একটা অংশ খানিকটা উঁচু হয়েছে (পজিটিভ বা ধনাত্মক) এবং অন্য অংশ খানিকটা নিচু হয়েছে (নেগেটিভ বা ঋণাত্মক)। ছবিতে দেখানো

হয়েছে যে দ্বিতীয় তরঙ্গটা এমনভাবে এসে হাজির হয়েছে যে সেটি প্রথম তরঙ্গেও ঠিক বিপরীত। অর্থ্যাৎ যখন মাধ্যমের একটা অংশ প্রথম তরঙ্গের কারণে উপরে উঠেছে ঠিক তখন সেই অংশটুকু দ্বিতীয় তরঙ্গের কারণে একেবারে সমান পরিমাণ নিচে নেমেছে। তরঙ্গ দুটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, বিস্তার সমান তাই অন্য অংশেও প্রথম তরঙ্গের কারণে মাধ্যমটা যখন নিচে নামছে তখন দ্বিতীয় আরেকটা তরঙ্গের কারণে সেটা ঠেলে উপরে উঠছে।

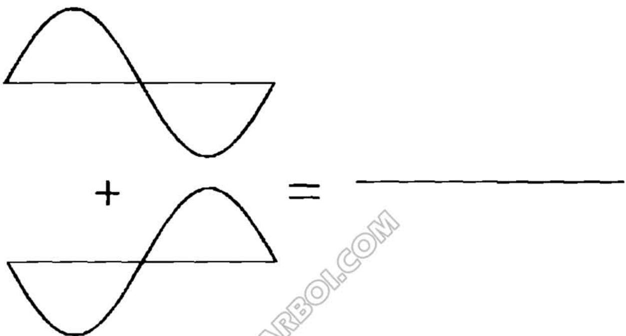

10 নং ছবি: দুটি বিপরীত তরঙ্গ একটা আরেকটার সাথে যোগ হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

কাজেই আমরা বুঝতে পারছি কী ঘটবে, দেখা যাবে দুটি তরঙ্গ একটা আরেকটাকে বাতিল করে দিচ্ছে। অর্থাৎ গণিতের নিয়ম মেনে পজিটিভ ও নেগেটিভ একত্র হয়ে যোগফল হচ্ছে শূন্য। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ আসছে কিন্তু আমরা দেখব তারা একত্র হয়ে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বোঝাই যাচ্ছে এর উল্টো ব্যাপারটিও ঘটতে পারত। অর্থাৎ একই জায়গায় যদি দুটো তরঙ্গ এসে হাজির হয় যারা হুবহু একই রকম তখন তারা গাণিতিক নিয়মে একত্র হয়ে মূল তরঙ্গের দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ঠিক যেরকম 11 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

এক জায়গায় দুটি তরঙ্গ যে হুবহু একভাবে কিংবা একেবারে বিপরীতভাবে আসবে এমন কোনো কথা নেই, তারা একটুখানি সরে আসতে পারে। অর্থাৎ একটি তরঙ্গ যখন :

$$y_1 = y_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right]$$

তখন আরেকটি তরঙ্গ

$$y_2 = y_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt) + \varphi\right]$$

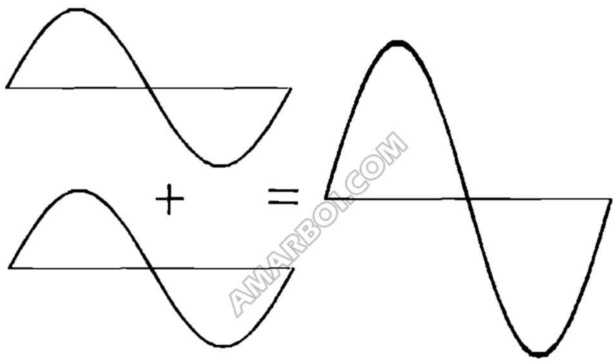

11 নং ছবি: দুটো হুবহু একই রকম তরঙ্গ যখন যুক্ত হয় তখন তার আকার দ্বিগুণ হয়ে যায়।

তরঙ্গ দুটি যখন হুবহু একরকম (11 নং ছবিতে দেখানো) তখন φ-এর মান শূন্য (কিংবা 2π, 2π, 6π ...) আবার যখন দুটি তরঙ্গ পুরোপুরি একটা আরেকটার বিপরীত তখন φ-এর মান π (অথবা 3π, 5π, 7π ...)। কিন্তু দুটি তরঙ্গকে যে সবসময় হুবহু এক কিংবা পুরোপুরি বিপরীত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, অর্থাৎ $\varphi = n\pi$ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই (যখন $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$)। n এর মান 0.13, 2.39 এরকমও তো হতে পারে—তখন কী হয় সেটা 12 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। তরঙ্গের রূপ বোঝার জন্যে আমরা যেহেতু পাশাপাশি তার গাণিতিক রূপটাও দেখে যাচ্ছি তাই যখন দুটি তরঙ্গ একটার তুলনায় অন্যটা

খানিকটা সরে যায় তখন দুটোর যোগফল কী হয় আমরা সেটাও বের করতে পারি। সেটা হচ্ছে

$$y = y_1 + y_2 = y_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right] + y_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt) + \varphi\right]$$

$$y = y'_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt) + \varphi'\right]$$

অর্থাৎ তরঙ্গের বিস্তার (y'_o) বা উচ্চতাটুকু ভিন্ন এবং সেটা কতটুকু সরে গেছে (φ') সেটা ভিন্ন। কিন্তু, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং অন্যকিছু মূল দুটি তরঙ্গের মতোই। y'_0 এবং φ' সমান কত সেটা বের করা খুবই সহজ, কাজেই এটা আমি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, উত্তরটা কী হবে শুধু সেটা বলে দিই :

$$y'_0 = \sqrt{2(1 + \cos\varphi)}\, y_0$$

$$\varphi' = \tan^{-1}\left(\frac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi}\right)$$

তরঙ্গের যোগ বিয়োগ বলতে আমরা বুঝিয়েছি যে, দুটো (কিংবা বেশি) তরঙ্গ একত্র হয়ে সেটা নতুন আরেকটা তরঙ্গ হতে পারে—এই প্রক্রিয়াটার নাম (Interference) ইন্টারফিয়ারেন্স, বাংলায় বলা হয় ব্যতিচার। এই বইয়ে একটু কটমটে হলেও আমরা ইংরেজি ইন্টারফিয়ারেন্স শব্দটাই বেশি ব্যবহার করব। আমরা এতক্ষণ যে-বিষয়গুলো আলোচনা করেছি সেখান থেকে দেখেছি ইন্টারফিয়ারেন্সের কারণে দুটি তরঙ্গের সম্মিলিত রূপ ছোটও হয়ে যেতে পারে, আবার বড়ো হয়ে যেতে পারে। যখন ছোট হয় তখন আমরা বলি ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স (Destructive Interference) যখন বড় হয় তখন বলি গঠনমূলক ইন্টারফিয়ারেন্স (Constructive Interference)।

এ পর্যন্ত আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি সেখানে একটা নির্দিষ্ট ব্যাপার কিন্তু এখনো জোর দিয়ে বলা হয়নি, সেটা বলে দেওয়া ভালো। গঠনমূলক বা ধ্বংসাত্মক যে-ধরনের ইন্টারফিয়ারেন্সই হোক না কেন সেগুলো ঘটার একটা পূর্বশর্ত রয়েছে, সেটা হচ্ছে তরঙ্গগুলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান হতে হবে। দুটি তরঙ্গের যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ভিন্ন হয় তাহলে তার ভেতরে ইন্টারফিয়ারেন্সটা আর নির্দিষ্ট থাকে না, সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। আমাদের চারপাশে অনেক রকম তরঙ্গ, কিন্তু সেই তরঙ্গগুলোতে সব ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রয়েছে তাই আমরা

সেভাবে চারপাশে ইন্টারফিয়ারেন্স দেখতে পাই না। কেউ যদি ইন্টারফিয়ারেন্স দেখতে চায় তাহলে খুব যত্ন করে একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তৈরি করতে হয়। 12 নং ছবিতে দুটো তরঙ্গ দেখানো হয়েছে—তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান নয় তাই দুটি তরঙ্গ এক জায়গায় হয়তো যুক্ত হয়ে আরও বড় হয়ে যাচ্ছে, অন্য জায়গায় একটি আরেকটিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

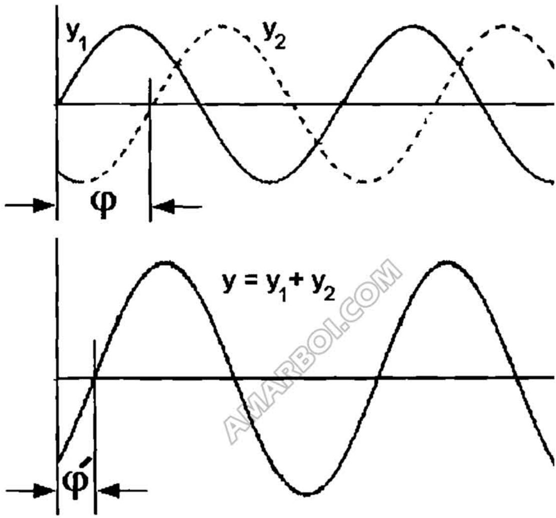

12 নং ছবি: y_1 এবং y_2 যোগ করে y তরঙ্গটি পাওয়া গেছে। y-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য y_1 এবং y_2-এর সমান কিন্তু উচ্চতা (amplitude) এবং সরে যাওয়া (Phase)-এর পরিমাণ ভিন্ন।

6. নিউটনের রিং

আমার ধারণা যারা ধৈর্য্য ধরে এইটুকু পড়ে এসেছে তারা এবার মনে মনে খানিকটা বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলছে, "কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কথা বলে কীসব তরঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বলে যাচ্ছে? কোয়ান্টাম মেকানিক্স কোথায়?"

আসছে—কোয়ান্টাম মেকানিক্স আসছে। কেউ যদি তরঙ্গের ব্যাপারটা ভালো করে না বোঝে, তাহলে আসলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সটাও ভালো করে বুঝবে না—তাই নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছি যে যারা বইটা পড়ছে তারা যেন তরঙ্গের বিষয়টা ভালো করে বুঝে নেয়।

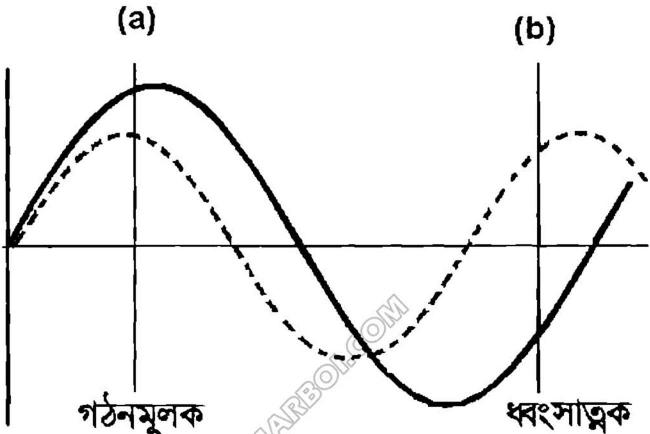

13 নং ছবি: দুটি তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান নয় তাই এক জায়গায় (a) দুটির মাঝে গঠনমূলক ইন্টারফিয়ারেন্স হতে পারে আবার অন্য জায়গায় (b) দুটি তরঙ্গের মাঝে ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স হতে পারে।

আমরা তরঙ্গের যোগ বিয়োগ নিয়ে কথা বলার সময় দেখেছি যে দুটো তরঙ্গ যদি একরকম হয় তাহলে তারা একত্র হয়ে একটা বড় তরঙ্গ হতে পারে—আবার যদি একটা আরেকটার বিপরীত হয় তাহলে দুটো একত্র হবার সময় একটা আরেকটাকে ধ্বংস করে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা যদি পরীক্ষা করে দেখানো যেত তাহলে সবাইকে বিশ্বাস করানো খুব সোজা হতো। আমরা অবিশ্যি আগেই বলেছি তরঙ্গের ইন্টারফিয়ারেন্স দেখার জন্যে একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের প্রয়োজন—তা না হলে এক সময় এক জায়গায় যে দুটি তরঙ্গ একটা আরেকটার সাথে গঠনমূলক ইন্টারফিয়ারেন্স করছে সেই দুটি তরঙ্গই আবার অন্য

জায়গায় কিংবা অন্য সময়ে ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স করতে পারে—যার অর্থ আমরা হয়তো এর কোনোটাই দেখতে পারব না। তবুও আমরা হাল ছেড়ে না দিয়ে চেষ্টা করে দেখি। আমরা ইন্টারফিয়ারেন্স দেখার জন্য যে-তরঙ্গটি বেছে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আলো।

যাদের 1 নং তালিকাটির কথা কিংবা 2 নং ছবিটির কথা মনে আছে তারা নিশ্চয়ই রীতিমতো চমকে উঠেছে—কারণ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই কম 1mm জায়গার ভেতর একটি দুটি নয়, প্রায় দুই হাজার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাশাপাশি রেখে দেওয়া যাবে—এরকম ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ভেতর ইন্টারফিয়ারেন্স আমরা কেমন করে দেখব? ল্যাবরেটরিতে নিখুঁত যন্ত্রপাতি দিয়ে এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে অবশ্যই সেটা দেখা সম্ভব কিন্তু আমরা সেটা দেখতে চাইছি আমাদের ঘরে বসে হাতের কাছে যা আছে সেগুলো দিয়ে।

আলোর ইন্টারফিয়ারেন্স দেখার জন্য তোমার দুটো জিনিস দরকার, একটা চশমা এবং একটা সমতল কাচ। সবার বাসাতেই চশমা আছে—সমতল কাচের জন্য একটা আয়না (কিংবা মোবাইল টেলিফোনের ওপরের স্ক্রিন।) ব্যবহার করতে পার। চশমাটা নিয়ে সমতল কাচের উপর চেপে ধরে ঠিক যেখানে চশমার কাচটা কাচটাকে স্পর্শ করেছে সেখানে তাকাও, যদি খুব ভালো করে লক্ষ করো তাহলে তোমার মনে হবে চশমার কাচের নিচে বুঝি কালো একটু ময়লা লেগে আছে। এটা ময়লা নয় বোঝার জন্য খুব ভালো করে চশমার কাচ এবং সমতল কাচ পরিষ্কার করে আবার চশমার কাচটা চেপে ধরে দেখতে সেই কালো বিন্দুটি ফিরে এসেছে। চশমার কাচের উপর থেকে চাপ সরিয়ে নিলে সেই কালো বিন্দুটিও অদৃশ্য হয়ে যাবে। কালো বিন্দুটি খুব ছোট এবং মোটামুটি খুবই অস্পষ্ট, তাই প্রথম প্রথম দেখতে একটু অসুবিধে হতে পারে। দেখার জন্যে চশমায় চেপে ধরে একটু ডানে বামে নাড়ালে সেই কালো বিন্দুটিও ডানে বামে নড়বে-কোনোকিছু নড়লে আমরা সেটা চট করে দেখে ফেলি তাই কালো বিন্দুটিও তখন চট করে চোখে পড়বে।

চশমার বাঁকা কাচ ঠিক যেখানে সমতল কাচকে স্পর্শ করছে সেটা আসলে পদার্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত নিউটনের রিংয়ের পরীক্ষা। তুমি যদি এই পরীক্ষাটা একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে করতে তাহলে কালো বিন্দুটি ঘিরে অনেকগুলো রিং দেখতে পেতে—যেহেতু আমাদের চারপাশের আলোতে সব ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রয়েছে তাই সেই রিংগুলো দেখতে পাই না—শুধু মাঝখানের কালো বিন্দুটা দেখতে পাই। আমরা কেন এই কালো বিন্দুটা দেখতে পাই সেটা 14 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

কালো বিন্দুটা দেখার জন্যে চশমার কাচটা বেশ জোরে সমতল কাচে চেপে ধরতে হয়, আমাদের ধারণা হতে পারে যে তখন বুঝি একটা কাচ আরেকটা কাচকে স্পর্শ করে ফেলেছে। আসলে তুমি যত জোরেই চেপে ধরো মাঝখানে একটা ফাঁক থেকেই যাবে আর সেখানে বাতাসের সূক্ষ্ম একটা আস্তরণ থেকেই যাবে। কাজেই এখানে যদি কোনো আলোকরশ্মি এসে হাজির হয় তাহলে ছবিতে দেখানো উপায়ে চশমার কাচের ভেতরের অংশ এবং সমতল কাচের উপরের অংশ থেকে সেটি প্রতিফলিত হবে। আমরা আগে দেখেছি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার জন্যে চেষ্টা করার সময় যে-তরঙ্গটা প্রতিফলিত হয় সেটা অবিকৃত থাকে।

অর্থাৎ চশমার কাচের ভেতর থেকে যে রশ্মিটা (a) প্রতিফলিত হবে সেটা অবিকৃত থাকবে (6, 7 এবং 8 নং ছবি)। আবার রশ্মির যে-অংশটা চশমার কাচ থেকে বের হয়ে বাতাসের আস্তরণ পার হয়ে সমতল কাচে প্রতিফলিত হবে (b) সেটা হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবার চেষ্টা করছে তাই সেটা পুরোপুরি উল্টে যাবে। অর্থাৎ (a) এবং (b) একটা আরেকটার উল্টো এবং তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলবে। একারণে আমরা ঠিক এই বিন্দুতে দেখব অন্ধকার বা একটা কালো বিন্দু। সকল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্যেই এটা সত্যি তাই এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো না হলেও আমরা অত্যন্ত সহজ এই মজার পরীক্ষা করে আলোর ইন্টারফিয়ারেন্স দেখতে পারি।

এটা দেখা সম্ভব হয় কারণ আলো একটা তরঙ্গ। ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে তরঙ্গের ধর্ম।

7. সাবানের ফেনা

চশমার কাচ দিয়ে নিউটনের রিংয়ের এই পরীক্ষা দিয়ে কেউ যদি পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয় তাহলে আমরা তার জন্যে আরও একটা সহজ পরীক্ষার কথা বলতে পারি। এই পরীক্ষাটা আগেরটার চাইতেও সহজ। এটা করার জন্যে হাতে সাবান আর পানির একটু ফেনা তৈরি করে বুড়ো আঙুলের আর তর্জনীর মাঝখানে (15 নং ছবি) পাতলা একটা বুদবুদের আস্তরণ তৈরি করে সেটা এমনভাবে রাখো যেন তার থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে তোমার চোখে পড়ে। ভালো করে লক্ষ করলে প্রথমে সেখানে নানা রংয়ের খেলা দেখতে পাবে। সেদিকে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাবে, দেখবে সেখান থেকে আলোর প্রতিফলন কমে আসছে। যেটা একটু আগে আয়নার মতো উজ্জ্বল ছিল হঠাৎ করে সেটা আলোহীন নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। যখন এটা আলোকে আর প্রতিফলন করতে

পারবে না তখন সেটা অবিশ্যি খুব বেশি সময় টিকে থাকবে না—এক সময় ফেটে যাবে।

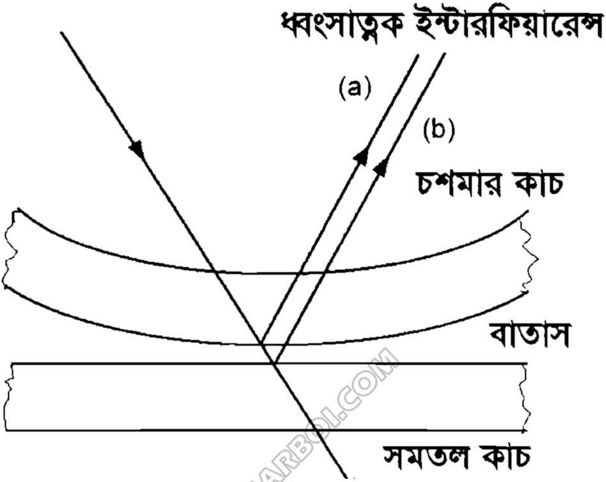

14 নং ছবি: (a) রশ্মিটি প্রতিফলিত হচ্ছে ঘন মাধ্যম (চশমার কাচ) থেকে হালকা মাধ্যমের (বাতাস) মাঝে যাবার সময় তাই এর Phase (দশা)র কোনো পরিবর্তন হয়নি।(b) রশ্মিটি প্রতিফলিত হয়েছে হালকা মাধ্যম (বাতাস) থেকে ঘন মাধ্যমে (সমতল কাচ) যাবার সময় তাই এর Phase-টির পরিবর্তন হয়েছে—অর্থাৎ উল্টে গেছে। রশ্মি দুটি একটি আরেকটির বিপরীত তাই তারা একটা আরেকটাকে ধ্বংস করে ফেলেছে।

ব্যাপারটা কী ঘটে সেটা 16 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে, যখন শুরু করা হয় তখন সাবানপানির এই আস্তরণটি থাকে তুলনামূলকভাবে পুরু (আমাদের

দৈনন্দিন জীবনে যা-কিছু দেখি তার তুলনায় নয়—আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তুলনায়) যতই সময় যেতে থাকে ততই এই সাবানপানির আস্তরণের পানিটুকু বাষ্পীভূত হয়ে সেটা পাতলা হতে থাকে। পাতলা হতে হতে একসময় যখন সেটা আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকেও ছোট হয়ে যায় তখন এই বিচিত্র ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করে—এটা থেকে আলোর প্রতিফলন বন্ধ হতে শুরু করে। কেন এটা ঘটে সেটা 16 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। সাবানপানির আস্তরণ বা বুদবুদের উপরের পৃষ্ঠ থেকে যে-আলো প্রতিফলিত হয় সেটা হালকা মাধ্যম (বাতাস) থেকে ঘন মাধ্যমে (সাবানপ্যানির আস্তরণ) যাবার সময় প্রতিফলিত হয়েছে তাই সেটা উল্টে গেছে। আলোকরশ্মির যে-অংশটা সাবানপ্যানির আস্তরণের ভেতরের অংশ থেকে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা ঘন মাধ্যমে (সাবানপানির আস্তরণ) থেকে হালকা মাধ্যমে (বাতাস) যাবার সময় প্রতিফলিত হয়েছে তাই সেটার কোনো পরিবর্তন হবে না। রশ্মির এক অংশ অপরিবর্তিত থাকে অন্য অংশ পুরো পরিবর্তিত হয়ে উল্টে যায়। এই দুটো যখন একটার সাথে অন্য অংশটা যুক্ত হয় তখন একটা আরেকটার বিপরীত বলে ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স দিয়ে একে অন্যকে ধ্বংস করে ফেলে। তাই কোনো আলো আর প্রতিফলিত হতে পারে না। যে-সাবানপানির আস্তরণ থেকে আয়নার মতো আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল হঠাৎ সেটা অন্ধকার হয়ে যায়।

15 নং ছবি: সাবানের বুদবুদ তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝে তৈরি করে সেদিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে খুব ধীরে ধীরে সেখান থেকে আলোর প্রতিফলন কমে আসছে।

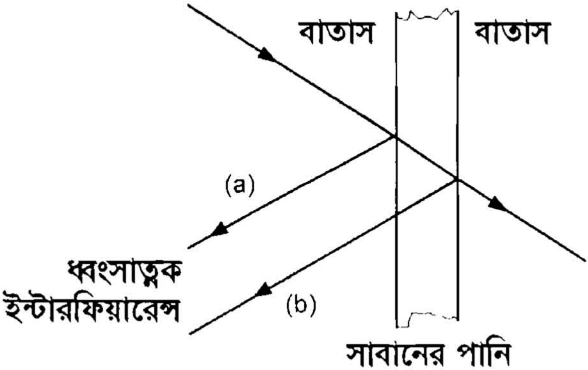

16 নং ছবি: সাবানের পানি দিয়ে তৈরি পাতলা আস্তরণের উপরের পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত আলো (a) উল্টে যায়। আস্তরণের ভেতরের অংশ থেকে প্রতিফলিত আলো, (b) অবিকৃত থেকে যায়—একটা আরেকটার বিপরীত তাই পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলে।

এটা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে কুচকুচে কালো হতে পারে না—কারণটা তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ—তার কারণ আমাদের চারপাশের যে আলো রয়েছে তার সবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক নয়—কোনো আলোর জন্য ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স হলেও অন্য আলোর জন্যে সেটা পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স নয়—খানিকটা রক্ষা পেয়ে যায়।

এবারে তোমরা নিজেরাই নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যখন তোমরা হাতে সাবানপানির বুদবুদ লাগিয়ে প্রথম এই পরীক্ষাটা শুরু করেছিলে তখন কেন এখানে নানা রংয়ের খেলা দেখেছিলে। প্রথমে আস্তরণটা যথেষ্ট পুরু ছিল তখন উপরের পৃষ্ঠ এবং নিচের পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত আলো হয়তো কোনো-একটা নির্দিষ্ট রংয়ের জন্যে ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স হয়েছে—সেই আলোটা সেখান থেকে সরে গেছে। সব রং থাকলে আমরা সেটাকে বর্ণহীন দেখি—একটা রং সরে

গেলে সেটা আর বর্ণহীন থাকে না—যে-রংগুলো রয়ে গেছে সেটা তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমার ধারণা তোমাদের এতক্ষণে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে এবং তোমরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলছ, তরঙ্গ নিয়ে অনেক হয়েছে—এবারে কোয়ান্টাম মেকানিক্স শুরু করা যাক।

শুরু করার আগে শুধু তোমাদের শেষবার মনে করিয়ে দিই: আলো হচ্ছে তরঙ্গ—অবিশ্বাস করার কিছু নেই তোমরা নিজেরাই সেটা পরীক্ষা করে দেখেছ।

17 নং ছবি: একটা অন্ধকার ঘরে তুমি বসে আছ, তোমার সামনে একটা টর্চলাইট এবং খুব ধীরে ধীরে টর্চলাইটের আলো কমিয়ে আনা হচ্ছে।

8. ফোটা থেকে ফোটন

আমরা সবাই পানির ট্যাপ খুলে পানির ধারা ব্যবহার করেছি এবং আবার পানির ট্যাপ বন্ধ করে পানির ধারাটা বন্ধ করে দিয়েছি। পানির ট্যাপ খোলা এবং বন্ধ করার মাঝে একটা ব্যাপার তোমরা আলাদা করে লক্ষ করেছ কি না জানি না—যারা লক্ষ করেনি, তাদেরকে এবাওে সেটা লক্ষ করতে বলছি।

ধরা যাক একটা পানির ট্যাপ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ছে এবং তোমাকে বলা হলো খুব ধীরে ধীরে ট্যাপটা বন্ধ করতে। বন্ধ করা শুরু করলে তুমি কী দেখবে?

অবশ্যই যখনই ট্যাপটা ধীরে ধীরে বন্ধ করা হতে থাকবে পানির ধারাটা কমতে থাকবে এবং একটু আগে যেটা মোটা একটা পানির ধারা ছিল দেখতে দেখতে সরু একটা ধারা হয়ে যাবে। এবারে আমি যদি তোমাকে বলি তুমি পানির ট্যাপটা খুব ধীরে ধীরে এমনভাবে বন্ধ করো যেন পানির ধারাটা সরু হতে হতে প্রথমে একটা সুতার মতো সরু হবে তারপর আরও সরু হয়ে সেটা একটা চুলের মতো সরু হয়ে যাবে। তুমি কি সেটা করতে পারবে?

যারা ব্যাপারটা কখনো খেয়াল করে দেখনি—তারা চেষ্টা করে দেখো, দেখবে তুমি সেটা করতে পারবে না। পানির ধারা অনির্দিষ্টভাবে সরু হতে পারে না—যতটুকু সম্ভব সরু হওয়ার পর হঠাৎ করে সেটা আর ধারা হিসেবে থাকবে না। তখন এটা ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়তে থাকবে। তুমি যদি ট্যাপটা আরও একটু বন্ধ করে দাও তাহলে ফোঁটাগুলোর সংখ্যা আরও কমে আসবে। যদি ট্যাপটা আরও বন্ধ করে দাও তাহলে ফোঁটাগুলোর সংখ্যা আরও কমে আসবে এবং বেশ সময়ের ব্যবধানে একটা একটা করে সেটা পড়বে। মজার ব্যাপার হচ্ছে তুমি ট্যাপটা আচ্ছামতন বন্ধ করে বা খুলে কোনোভাবেই একটা বড় পানির ফোঁটা কিংবা একটা ছোট পানির ফোটা তৈরি করতে পারবে না। পানির ফোঁটার আকার সবসময়েই সমান। (তার একটা কারণ আছে, পানির ফোঁটা কতটুকু বড় হবে সেটা তার পৃষ্ঠটানের উপর নির্ভর করে, যেহেতু পানির পৃষ্ঠটান নির্দিষ্ট তাই পানির ফোঁটার আকারও নির্দিষ্ট। ফোঁটার ওজন যখন পৃষ্ঠটান থেকে বেশি হয়ে যায় তখন সেটা ফোঁটা হিসেবে নিচে পড়ে। পানিতে সাবান দিলে পৃষ্ঠটান কমে যায়, তাই সাবান দেওয়া পানির ফোঁটাগুলো বেশ ছোট হতে পারে।)

এবারে আমরা একটা কাল্পনিক পরীক্ষা করি। তুমি একটা অন্ধকার ঘরে বসে আছ এবং তোমার চোখের দিকে একটা টর্চলাইট তাক করে রাখা আছে (17 নং ছবি)। টর্চলাইটটা থেকে নির্দিষ্ট একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বের হয়—(যেমন : সবুজ আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 550nm)। টর্চলাইটটা একটা বিশেষ ধরনের টর্চলাইট, তার সুইচটা টিপে তার থেকে বের হওয়া আলোর পরিমাণ যত ইচ্ছা কমানো সম্ভব। আমরা আরও একটা বিষয় কল্পনা করে নিই, সেটা হচ্ছে তোমার চোখ অস্বাভাবিক সংবেদনশীল, আলো যত কমই হোক তুমি সেটা দেখতে পারো।

এবারে আমরা পরীক্ষাটা শুরু করি। তোমার চোখের ওপর আলোটা ফেলা হয়েছে। প্রথমে চোখ-ধাঁধানো সবুজ আলো ছিল এবং টর্চলাইটের সুইচ টিপে আলো কমিয়ে আনা হচ্ছে। তুমি দেখছ আলো কমে আসছে এবং কমে আসছে এবং কমে আসছে। এভাবে কমাতে থাকলে আমরা শেষ পর্যন্ত কী দেখব?

আমার ধারণা তোমরা সঠিক উত্তরটা অনুমান করতে পেরেছ, তুমি হঠাৎ করে দেখবে আলোটি আর নিরবচ্ছিন্ন নয়। হঠাৎ করে আলোটি পানির ফোঁটার মতো একটা ঝলকানি হিসেবে আসছে। আলোর তীব্রতা কমিয়ে আনলে আলোর ঝলকানির সংখ্যা কমে আসে কিন্তু প্রতিটি আলোর ঝলকানি হবে একই সমান তীব্র। বেশিও নয়, কমও নয়। ঠিক পানির ফোটার মতো। (14 নং ছবি)

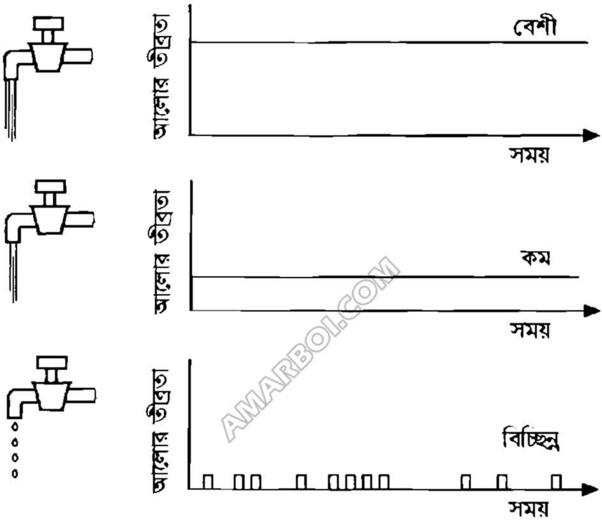

14 নং ছবি: পানির ট্যাপ বন্ধ করে দিতে থাকলে এক সময় যেরকম দেখা যায় পানি ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়তে শুরু করেছে, ঠিক সেরকম আলোর পরিমাণ কমিয়ে আনলে দেখা যায় সেটি আলাদা আলাদা আলোর বিচ্ছুরণ, সেটি নিরবচ্ছিন্ন নয়।

আমাদের চোখের সংবেদনশীলতা অসাধারণ। যে-মানুষ টেলিভিশন বা অন্য কোনো তীব্র আলো দেখে দেখে চোখের বারোটা বাজিয়ে ফেলেনি তারা খালিচোখেই রাতের আকাশে অ্যান্ড্রোমিতা গ্যালাক্সি দেখতে পারে। আমাদের

চোখের সংবেদনশীলতা যদি আর মাত্র দশগুণ বেশি হতো তাহলে সত্যি সত্যি আমরা আলো কমিয়ে এনে আলাদা আলাদা আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পেতাম। ...দের দুর্ভাগ্য চোখ বিবর্তনের ভেতর দিয়ে সেই পর্যায়ে যেতে পারেনি। তাই খালিচোখে কখনোই আমরা আলোর আলাদা আলাদা বিচ্ছুরণ দেখতে পাই না। তবে এটি সত্যি আছে, চোখ থেকে বেশি সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা সেটা সবসময়ই দেখছেন। এরকম একটা যন্ত্রের নাম ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব (Photomultiplier tube), যখন খুব কম আলো মাপতে হয় তখন এটি ব্যবহার করতে হয়। (19 নং ছবি)

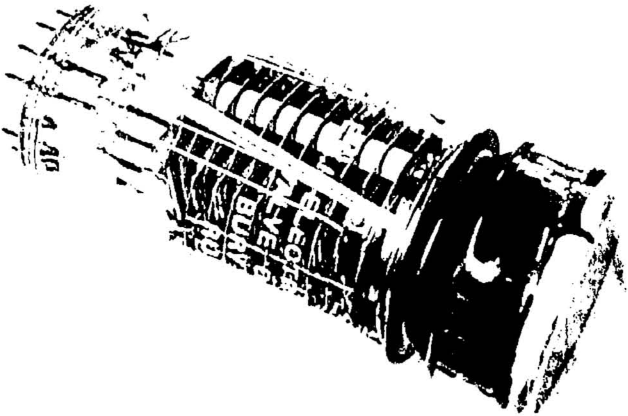

19 নং ছবি: ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব

মজার ব্যাপার হচ্ছে ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব দিয়ে আলোর তীব্রতা মাপা হয় না, আলোর ফোটনের সংখ্যা গোনা হয়। একটা করে আলোর ঝলকানি ফটো মাল্টিপ্লায়ারে এসে ঢুকে সেটা একটা করে সিগনালের জন্ম দেয়, সেই সিগনাল একটা 'ক্লিক' করে, বিজ্ঞানীরা সেটা গোনেন।

আলো মাপা হয় না, আলো গোনা হয়। যার কারণ আলো আসলে এক ধরনের কণা। আমার কথা বিশ্বাস না করলে যে-কেউ একটা ফটো মাল্টিপ্লায়ার

দিয়ে আলো মাপার চেষ্টা করতে পারে। তারা অবাক হয়ে দেখবে আলো যখন কমে আসে তখন সেটা পানির ফোঁটার মতন, আলাদা আলাদা। ঠিক যেন একটা করে কণা।

আর কাকতালীয়ভাবে পানির ফোঁটার সাথে মিল রেখেই যেন আলোর সেই কণাকে ডাকা হয় ফোটন!

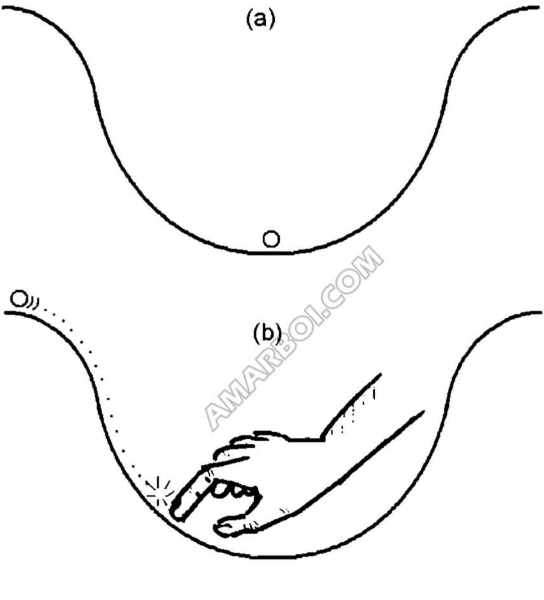

20 নং ছবি: (a) একটা বাটিতে আটকে থাকা একটা মারবেল, নিজে থেকে বের হতে পারে না, (b) ঠোকা দিয়ে খানিকটা শক্তি দিলে বের হয়ে আসতে পারে।

৭. আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কার

আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল থিওরি অফ রিলেটিভিটি—কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় তার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা

আবিষ্কারের জন্য, সেই আবিষ্কারের নাম ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট (Photoelectric Effect)।

ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বিষয়টা কী সেটা বোঝা খুবই সহজ—কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটা কেমন করে হয় সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ধাতব পদার্থের উপর আলো ফেললে সেখান থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বের হয়ে আসে। ব্যাপারটি বিচিত্র কিছু নয়—আমরা যেসব পদার্থকে ধাতব পদার্থ বলি তার ভেতর কিছু ইলেক্ট্রন মোটামুটি মুক্ত অবস্থায় থাকে। সবকিছুই তৈরি হয় অণু-পরমাণু দিয়ে, আমরা জানি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস আর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রোটনের পজিটিভ চার্জের কারণে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন ঘুরপাক খায়। নিউক্লিয়াসে যে-কয়টি প্রোটন থাকে, পরমাণুতে ঠিক সেই কয়টা ইলেকট্রন থাকে।

ধাতব পদার্থে একটু বিচিত্র ব্যাপার ঘটে, পরমাণু তার বাইরের দিকের ইলেকট্রনগুলোকে নিজের কাছে আটকে না রেখে ছেড়ে দেয়। কাজেই সেই ইলেকট্রনগুলো পুরো ধাতব পদার্থেরর মাঝে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, যে-কারণে বলা হয় ধাতব পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর কারণে ধাতব পদার্থে বিদ্যুৎপ্রবাহ করানো যায়, তাপ প্রবাহ করানো যায়।

তবে এই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু একেবারে পুরোপুরি মুক্ত নয় যে নিজে থেকে ধাতব পদার্থ থেকে বের হয়ে আসতে পারে—সেগুলো ধাতব পদার্থের মাঝে আটকা পড়ে আছে। অনেকটা একটা বাটির মাঝে পড়ে থাকা বলের মতো, বাটির তলায় নাড়াচাড়া করতে পারে কিন্তু এমনিতে সেটা বের হতে পারবে না, কিন্তু যদি ঠোকা দিয়ে খানিকটা শক্তি দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গড়িয়ে বের হয়ে আসতে পারে (20 নং ছবি)।

ধাতব পদার্থে আটকে থাকা এই ইলেকট্রনগুলোর খুব বিচিত্র একটা ধর্ম আছে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি লম্বা হয় তাহলে অত্যন্ত তীব্র আলো দিয়েও ধাতব পদার্থ থেকে একটা ইলেকট্রনকেও বের করে আনা যায় না। কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি ছোট হয় তাহলে অত্যন্ত মৃদু আলো দিয়েও ধাতব পদার্থ থেকে একটি দুটি ইলেকট্রনকে মুক্ত করে নিয়ে আসা যায়।

আইনস্টাইন সেটা ব্যাখ্যা করলেন খুব সহজ ভাষায়। তিনি বললেন, আলো হচ্ছে কণা। কাজেই সেই কণা ধাতব পদার্থের ভেতরে ইলেকট্রনকে ঠোকা দিয়ে বের করে আনতে পারে। যেহেতু ধাতব পদার্থের ভেতর থেকে বের করে আনতে হবে তাই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি দিতে হবে—আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি লম্বা হয় তাহলে সেই শক্তিটুকু থাকে না। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি ছোট হয় তাহলে শক্তিটুকু

থাকে। তার কারণ হিসেবে আইনস্টাইন বছর পাঁচেক আগে ম্যাক্সপ্লাংক নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানীর ব্যাখ্যাটা ব্যবহার করলেন। ম্যাক্সপ্লাংক আলট্রাভায়োলেট বিপর্যয় নামে একটা বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রায় বাধ্য হয়ে বলেছিলেন, আলোর কণার শক্তি E হচ্ছে

$$E = h\nu$$

যেখানে h হচ্ছে প্লাংঙ্কের ধ্রুবক যার মান $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J-s এবং γ হচ্ছে আলোর কম্পন। আমরা আগেই বলেছি আলোর গতিবেগ c হচ্ছে :

$$c = \lambda\gamma$$

যেখানে λ হচ্ছে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। কাজেই আমরা লিখতে পারি একটা আলোর কণার শক্তি E হচ্ছে :

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

অর্থাৎ λ যত বেশি হবে আলোর কণার শক্তি তত কম হবে এবং λ যত কম হবে আলোর কণার শক্তি হবে তত বেশি।

কাজেই যদি একটা ধাতব পদার্থ থেকে ইলেকট্রনগুলোকে বের করতে W শক্তির দরকার হয় তাহলে আমরা কোনো তরঙ্গ দের্ঘ্য এর λ_o জন্যে এই শক্তি পাওয়া সম্ভব সেটা বের করতে পারি :

$$W = \frac{hc}{\lambda_o}$$

$$\text{অর্থাৎ}\ \lambda_o = \frac{hc}{W}$$

কাজেই একটা ধাতব পদার্থে λ_o তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যত আলোই ফেলা হোক, সেই আলো একটা ইলেকট্রনও বের করতে পারে না। কারণ তখন কম শক্তির অনেকগুলো আলোর কণা ধাতব পদার্থের ইলেকট্রনকে ঠোকা দিচ্ছে, কোনোটাই ইলেকট্রনকে মুক্ত করতে পারছে না। যদি λ_o তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ধাতব পদার্থে ফেলা হতো তাহলে ইলেকট্রনের মুক্ত করতে যেটুকু শক্তি দরকার তার থেকে বেশি শক্তির আলোর কণা ইলেকট্রনকে ঠোকা দিয়ে বের করে আনতে পারত। আলো তীব্র না হলেও ক্ষতি

নেই—কারণ মৃদু আলো মানে কমসংখ্যক আলোর কণা—কিন্তু প্রত্যেকটা কণাই কিন্তু শক্তিশালী (21 নং ছবি)।

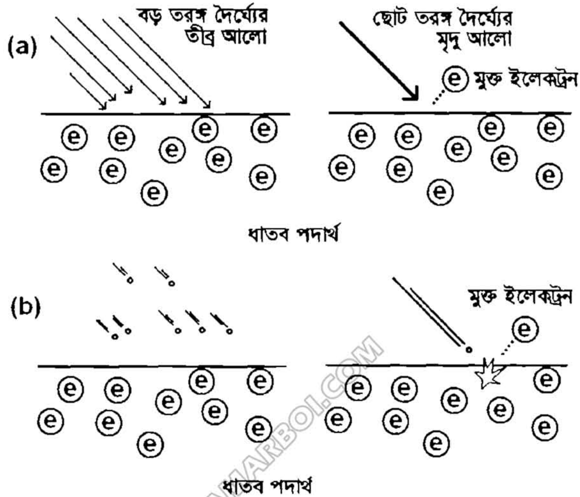

21 নং ছবি: (a) বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তীব্র আলো একটা ধাতব পদার্থ থেকে কোনো ইলেকট্রন মুক্ত করতে পারে না। কিন্তু কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অত্যন্ত মৃদু আলোও ধাতব পদার্থ থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করতে পারে। (b) তার কারণ বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তীব্র আলো আসলে খুব কম শক্তির অনেকগুলো আলোর কণা—যার কোনোটিরই ইলেকট্রনকে মুক্ত করার মতো শক্তি নেই। কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মৃদু আলো আসলে বেশি শক্তির অল্প কয়টি আলোর কণা, যার প্রত্যেকটিই ধাতব পদার্থ আটকে থাকা ইলেকট্রনকে মুক্ত করার মতো শক্তি রাখে।

আমি জানি তোমাদের মনে হতে পারে এত সহজ একটা জিনিস ব্যাখ্যা করে নোবেল পুরস্কার পাওয়া যায়? আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কিন্তু বিষয়টাকে মোটেও এত সহজ মনে হয়নি। আলোর তরঙ্গ-ধর্ম এত ভালোভাবে সবাই মেনে নিয়েছিল যে সেটাকে কণা বলতে অনেক বড় বুকের পাটার প্রয়োজন ছিল।

আমার ধারণা তোমরা যারা বইটা পড়ছ তাদের অনেকেই এখন বইটা ছুড়ে ফেলে দেবার কথা ভাবছ। তার কারণ আমি বইয়ের প্রথম অনেক কষ্ট করে তোমাদের বুঝিয়েছি আলো একটা তরঙ্গ। আলো যে তরঙ্গ সেটা বোঝানোর জন্যে আমি তোমাদের দিয়ে কিছু পরীক্ষাও করিয়েছি। যখন তোমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করে নিয়েছ যে আলো হচ্ছে তরঙ্গ তখন আমি বলতে শুরু করেছি আলো হচ্ছে কণা। শুধু যে বলছি তা না—আমি তার সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে শুরু করছি। ছোটখাটো সাক্ষ্য প্রমাণ নয়—বিশাল সাক্ষ্য প্রমাণ। স্বয়ং আইনস্টাইনের দেওয়া ব্যাখ্যা এবং তার জন্যে পাওয়া নোবেল পুরস্কার।

কিন্তু কথা হচ্ছে কোনটি সত্য? আলো কি কণা, নাকি তরঙ্গ। একটা কিছু তো একই সাথে কণা এবং তরঙ্গ হতে পারে না—কণা এবং তরঙ্গ খুবই ভিন্ন ভিন্ন দুটি ব্যাপার। কণা ছোট জায়গার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে তরঙ্গ বিশাল জায়গাজুড়ে যেতে থাকে। তাহলে যেটাকে তরঙ্গ বলে ভেবেছি সেটা আবার কণা হয় কেমন করে?

আমরা তার ব্যাখ্যা দেব, কিন্তু আগে থেকে সতর্ক করে রাখি। কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুবই রহস্যময় একটা বিষয়—এটা দিয়ে ব্যাখ্যা করার পর সাধারণত বিষয়টি আরও ভালো করে বোঝার পরিবর্তে মানুষজন আরও বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

10. একটুখানি ইলেকট্রন

আলো কি কণা নাকি তরঙ্গ সেটা নিয়ে কথা বলার আগে একটুখানি ইলেকট্রন নিয়ে কথা বলা যাক। যারা বিজ্ঞান নিয়ে কমবেশি পড়াশোনা করেছে তারা সবাই ইলেকট্রনের কথা জানে। পৃথিবীর সবকিছু তৈরি হয়েছে অণু-পরমাণু দিয়ে, পরমাণুর মাঝখানে থাকে নিউক্লিয়াস তাকে ঘিরে ইলেক্ট্রন ঘুরতে থাকে। বিষয়টা আমরা চোখে দেখি না কিন্তু কল্পনা করতে তো কোনো সমস্যা নেই। সত্যি কথা বলতে কি বিজ্ঞানের কিছু বোঝাতে হলে যে-ছবিটা আঁকা হয় (22 নং ছবি) সেটা হচ্ছে একটা পরমাণুর ছবি, মাঝখানে নিউক্লিয়াস, তাকে ঘিরে ইলেকট্রন ঘুরছে। ইলেকট্রনটিকে দেখানো হয় না—সে যে-কক্ষপথে ঘোরে সেই কক্ষপথটা দেখানো হয়।

ইলেকট্রন একটা কণা—তা না হলে সে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘোরে কেমন করে? ইলেকট্রন খুবই ছোট, আমরা খালি চোখে কখনো দেখতে পাই না কিন্তু সেটা যে আছে সেটা খুব সহজেই বুঝতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি তোমরা সবাই কখনো-না-কখনো সেটা দেখেছ। টেলিভিশনের স্ক্রিনে যে-ছবিটা ফুটে ওঠে সেটা তৈরি হয় ইলেকট্রন দিয়ে। টেলিভিশনের স্ক্রিনে বিশেষ আলো তৈরি করার প্রলেপ দেওয়া থাকে, ইলেকট্রন এসে সেটাকে আঘাত করলে সেখান থেকে আলো বের হয়ে আসে। ইলেকট্রন নিশ্চয়ই কণা, তা না হলে সেটা কেমন করে ছুটে এসে আঘাত করে? বিষয়টা তুমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে পার। টেলিভিশনের স্ক্রিনের কাছে এক টুকরো চুম্বক এনে ধরো, দেখবে সেখানকার ছবিটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রনের চার্জ রয়েছে, যার চার্জ আছে সেটা যদি চৌম্বকক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যায় তাহলে সেটা ঢেকে যায়।

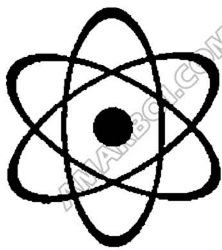

22 নং ছবি: শিল্পীদের আঁকা পরমাণুর ছবি। মাঝখানে নিউক্লিয়াস, তাকে ঘিরে ঘুরছে ইলেকট্রন।

তাই টেলিভিশন স্ক্রিনের সামনে চুম্বক ধরা হলে যে-ইলেকট্রনগুলোর যেখানে আসার কথা সেখানে সরাসরি না এসে আঁকাবাঁকা পথে যায় বলে ছবিগুলো এলোমেলো হয়ে যায়।

ইলেকট্রন যে একটা কণা সেটা দেখানোর জন্য আমরা আরও অসংখ্য পরীক্ষার কথা বলতে পারি—কিন্তু আপাতত এখানেই থামা যাক। যারা কোয়ান্টাম মেকানিক্স সম্পর্কে জানার জন্যে অধৈর্য হয়ে যাচ্ছ তারা নিশ্চয়ই ভাবছ আমি সেটা শুরু না করে অন্য কিছু নিয়ে কেন কথা বলছি।

যা-ই হোক বিজ্ঞানীরা যখন মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে ইলেকট্রন হচ্ছে কণা তখন হঠাৎ করে তাঁরা চমকে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে কোথাও কোথাও ইলেকট্রন এমনভাবে ব্যবহার করে যে সেটা বুঝি কণা নয়, সেটা হচ্ছে এক ধরনের তরঙ্গ। তরঙ্গের যে-বিশেষ ধর্মের কথা বলা হয়েছে গঠনমূলক ইন্টারফিয়ারেন্স কিংবা ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স—ইলেকট্রনকে দিয়েও সেগুলো করানো যায়। সত্যি কথা বলতে কি ইলেকট্রন এমনই চমৎকারভাবে তরঙ্গের মতো ব্যবহার করে যে সেটা দিয়ে বিজ্ঞানীরা মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে ফেললেন। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে ছোট জিনিস সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যেত না—ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা অবলীলায় সেগুলো দেখতে লাগলেন। (23 নং ছবি)

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা সত্যি? ইলেকট্রন কি কণা নাকি তরঙ্গ?

11. কণা নাকি তরঙ্গ?

এই বইয়ে আমি তোমাদের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম যে আলো হচ্ছে তরঙ্গ, যখন তোমরা সেটা বিশ্বাস করতে শুরু করলে তখন আমি উল্টো কথা বলতে শুরু করছি, যে আলো হচ্ছে কণা। এখানেই শেষ নয়, আমি ইলেকট্রন নিয়েও সেই একই কাজ করেছি, প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে ইলেকট্রন হচ্ছে কণা, যখন তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করতে শুরু করলে তখন আমি পরীক্ষানিরীক্ষা দিয়ে বলতে শুরু করলাম যে ইলেকট্রন হচ্ছে তরঙ্গ।

আমি যেটা করেছি পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসেও আসলে সেটিই ঘটেছে। প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন আলো হচ্ছে তরঙ্গ, আরও বেশি গবেষণা করে দেখা গেল আলো হচ্ছে কণা। ঠিক সেরকম ইলেকট্রনের বেলায় দেখা গেল সেটা হচ্ছে কণা। আরও বেশি গবেষণা করে দেখা গেল সেটা হচ্ছে তরঙ্গ। সোজা ভাষায় বলা যায়, আলো আর ইলেকট্রনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, দুটোকেই আমি তরঙ্গ হিসেবে দেখাতে পারি, আবার কণা হিসেবেও দেখাতে পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটা সত্যি?

একটা ধাক্কা খাবার জন্যে প্রস্তুত হও, উত্তরটা হচ্ছে দুটোই সত্যি। আমরা আমাদের পরিচিত জগতে যা-কিছু দেখি সেটা দেখে আমাদের মাথার মাঝে কিছু-কিছু ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বেলায় সে-ধারণাগুলো কাজ করে না—তার কারণ আসলে সেখানে অন্য এক ধরনের নিয়ম কাজ করে। আমরা সেটা পরিচিত জগতে দেখি না, কারণ সেটা কাজ করে খুব ক্ষুদ্র জগতে। যখন আমরা অণু-পরমাণুর জগতে চলে যাই শুধুমাত্র তখনই সেটা বাস্তব হয়ে

ওঠে—পরিচিত গাছপালা, বাড়িঘর, গাড়ি, মানুষের জগতে আমরা সেটা দেখতে পাই না। অণু-পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র জগৎটাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে আমাদের নূতন কিছু নিয়মের কথা বলতে হবে, সেগুলো একটু একটু করে বলি।

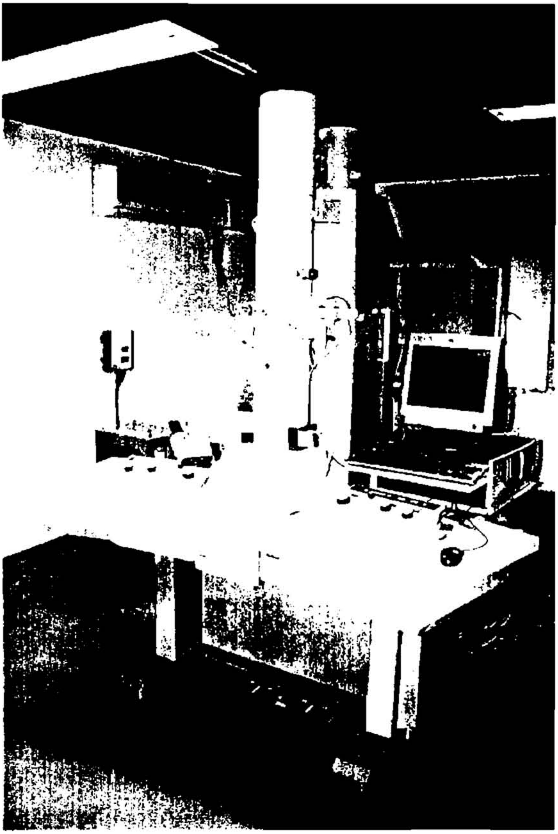

23 নং ছবি: ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত ছোট যে সেটা দিয়ে আলো দিয়ে যেটা দেখা যায় না সেটাও দেখা সম্ভব।

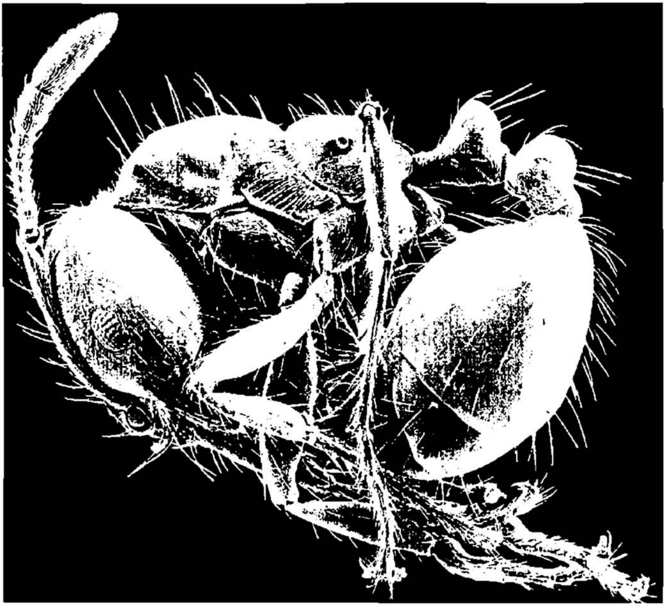

24 নং ছবি: ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা চমকপ্রদ ছবি

12. কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুরু

প্রথমেই বলে নিতে হবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগতে কোনোকিছুই কিন্তু সুনির্দিষ্ট নয়। আমাদের পরিচিত জগতে আমরা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে সবকিছু দেখি, ঘরের কোনায় একটা টেলিভিশন সেট, টেবিলের উপর একটা বই কিংবা দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো বলতে, দেখতে কিংবা বুঝতে কারও কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর জগতে আমরা কখনোই সেটা বলতে পারি না। আমাদের বলতে হয় হাইড্রোজেন পরমাণুর পাশে একটা ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা আছে কিংবা ইলেকট্রনের পাশে একটা পজিট্রন থাকার সম্ভাবনা আছে ইত্যাদি। সোজা কথায় 'আছে' না বলে বলতে হয় 'সম্ভাবনা' আছে। সম্ভাবনাটুকু কত বিজ্ঞানীরা সেটা হিসেবনিকেশ করে বের করে ফেলতে পারেন,

আর সেই হিসেবনিকেশ করার পদ্ধতিটারই সহজ সরল নাম হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

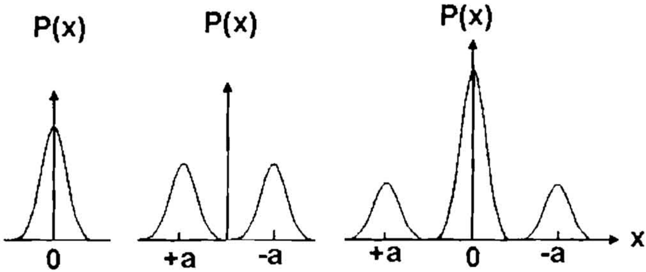

25 নং ছবি: P(x) হচ্ছে কোনো একটা কণাকে পাওয়ার সম্ভাবনা। এই ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি অবস্থায় একটা কণাকে দেখানো হয়েছে। প্রথম ছবিতে P(x)-এর মান সবচেয়ে বেশি $x = 0$-তে কাজেই সেটাকে পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি $x = 0$-তে। দ্বিতীয় ছবিতে কণাটাকে $x = a$ কিংবা-a-তে পাওয়ার সম্ভাবনা সমান। তৃতীয় ছবিতে দেখানো হচ্ছে কণাটাকে $x = 0, +a$ কিংবা $-a$ এই তিন জায়গাতেই পাওয়া যেতে পারে তবে $x = 0$-তে পাওয়ার সম্ভাবনা $x = +a$ কিংবা $-a$ তে পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে প্রায় দ্বিগুণ।

অণু-পরমাণুর জগতে কোনটা কোথায় পাওয়া যাবে আমরা সেটা কেমন করে বলি? উত্তর খুবই সোজা—আমরা সেটা বলি তার সম্ভাবনা বা প্রোবাবিলিটি ফাংশন (Probability Function) দেখে। 25 নং ছবিতে আমরা কয়েকটা প্রোবাবিলিটি ফাংশন এঁকেছি এবং সেটার দিকে তাকিয়েই আমরা বলতে পারি কণাটাকে সবচেয়ে বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়। প্রথম ছবিতে সেটা হচ্ছে $x = 0$-তে এবং সেখান থেকে আমরা যতই সরে যেতে থাকব কণাটাকে সেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা ততই কমতে থাকবে। দ্বিতীয় ছবিটিতে কণাটাকে $x = 0$-তে পাওয়ার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই। তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা $x = +a$ কিংবা $x = -a$-তে। আমি জানি একটা কণাকে দুই জায়গায় পাওয়ার সম্ভাবনা বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি সেটা নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে। আসলে যেটা বলছি ঠিক

সেটাই বোঝাচ্ছি, কণা একটা হতে পারে কিন্তু এটা মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে তাকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাওয়ার সম্ভাবনা সমান। তৃতীয় ছবিতে আমরা বলছি কণাটিকে এখন তিন জায়গায় পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এটাকে একই সাথে $x = 0$, $x = + a$ কিংবা $x = - a$-তে পাওয়া যেতে পারে। যেভাবে প্রোবাবিলিটি ফাংশন আঁকা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে $x = 0$-তে পাওয়ার সম্ভাবনা $x = a$ কিংবা $x = - a$-তে পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে দ্বিগুণ।

ব্যাপারটি বোঝা কঠিন হবার কথা নয় এবং তোমরা যদি ঠিক করে বুঝে থাকো তাহলে সম্ভবত তোমাদের মাথায় একটা প্রশ্ন কুটকুট করছে। প্রশ্নটা এরকম : ধরে নিচ্ছি প্রোবাবিলিটি ফাংশন দেখে আমরা একটা কণাকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা অনুমান করি। কিন্তু প্রোবাবিলিটি ফাংশনটা আমরা কেমন করে বের করি?

এর উত্তরটাও সহজ এবং এর উত্তরটাই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একেবারে গোড়ার কথা। কাজেই সবাই এটা ভালো করে লক্ষ করো।

সবকিছুর সাথেই এক ধরনের তরঙ্গ থাকে আর সেই তরঙ্গের বর্গটাই হচ্ছে প্রোবাবিলিটি ফাংশন। যারা বাক্যটা পড়ে ভ্রূ কুঁচকে ফেলেছে তারা আরও কয়েকবার পড়ো—কারণ এই বাক্যটাই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

যেহেতু সবকিছুর সাথেই একটা তরঙ্গ থাকে তাই এই বইয়ের শুরুতে আমরা তরঙ্গের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি—পরে কাজে লাগবে বলে।

আলো হচ্ছে কণা—কিন্তু সবকিছুর সাথেই একটা তরঙ্গ থাকে তাই আলো নামক কণার সাথে একটা তরঙ্গ আছে এবং আমরা সেটা এর মাঝে দেখেছি।

ইলেকট্রনও একটা কণা এবং ইলেকট্রনের সাথেও একটা তরঙ্গ আছে, তাই ইলেকট্রন ব্যবহার করে রীতিমতো মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

আমি বলেছি সবকিছুর সাথে একটা তরঙ্গ আছে—তার মানে তোমার সাথেও একটা তরঙ্গ আছে। তোমাকেও আমি 'তুমি' না বলে একটা তরঙ্গ বলতে পারি—তাতেও কোনো ভুল নেই। কিন্তু 'তুমি' কণার তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত ছোট যে সেটা হয়তো দেখার কোনো সুযোগ নেই।

সবকিছুর সাথে যে তরঙ্গ থাকে তাকে বলা হয় প্রোবাবিলিটি অ্যামপ্লিচুড ওয়েভ ফাংশন, (Probability amplitude Wave function) সংক্ষেপে ওয়েভ ফাংশন (Wave function)

একটা কণার সাথে জড়িত ওয়েভ ফাংশনের সমীকরণগুলো বিজ্ঞানীরা যেদিন বের করেছিলেন সেদিন থেকে পদার্থবিজ্ঞানের একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।

13. একটা উদাহরণ

তোমরা সবাই কাচের জানালা দিয়ে বাইরে দেখেছ, কেউ-কেউ হয়তো একটা জিনিস লক্ষ করে থাকবে, রাতের বেলা ঘরের ভেতর আলো জ্বালানো থাকলে জানালা দিয়ে বাইরে ভালো দেখা যায় না। তার কারণ জানালার কাচে ঘরের আলো হালকাভাবে প্রতিফলিত হয়—খুব ভালো প্রতিফলন নয়—কিন্তু সেটা লক্ষ করার মতো। যদি খুব সূক্ষ্মভাবে এই প্রতিফলনটা মাপতে তাহলে দেখতে যেটুকু আলো জানালার কাচে পড়ে তার 4% আলো প্রতিফলিত 96% ভেতর দিয়ে চলে যায়।

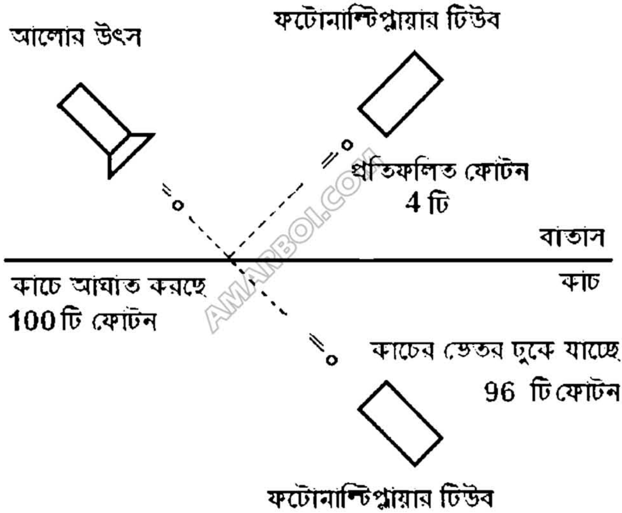

26 নং ছবি: কাচের উপরের পৃষ্ঠ থেকে শতকরা 4টি ফোটন উপরে প্রতিফলিত হয়, 96টি ভেতর দিয়ে চলে যায়।

মজার বিষয় হচ্ছে আলোর এই 4% প্রতিফলনকে কিন্তু ব্যাখ্যা করা মোটেও সহজ নয়। আমি জানি তোমরা সবাই ভুরু কুঁচকে ভাবছ এটা আর এমন কী কঠিন ব্যাপার? খুব ভালো আয়না হলে সেটা থেকে পুরোপুরি 100% আলো প্রতিফলিত হবে, যদি আয়নাটা ভালো না হয় তাহলে তার থেকে কম আলো প্রতিফলিত হবে—এর মাঝে বোঝাবুঝির কী আছে?

সমস্যাটা কী তোমাদের বলি। 26 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে একটা আলোর উৎস থেকে আলো কাচকে আঘাত করছে এবং খানিকটা আলো প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে—বাকিটুকু কাচের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আলোর তীব্রতা মোটামুটি বেশি ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্যা নেই—কিন্তু ধরা যাক আলোর তীব্রতা কমিয়ে নিয়ে আনা হলো এবং শেষ পর্যন্ত আমরা বিচ্ছিন্ন ফোটন পেতে শুরু করেছি—এখন সেই ফোটনকে আর মাপা হবে না, গোনা হবে! গোনার জন্যে আমরা ব্যবহার করছি ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব, একটা উপরে প্রতিফলিত ফোটনকে গোনার জন্যে—আরেকটা কাচের ভেতরে বাকি ফোটনগুলো গোনার জন্যে (কাচের ভেতরে ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব আসলেই বসানো যায় কি না—আপাতত সেটা নিয়ে তর্ক না করলাম!)

এখন যদি আমরা গুনতে থাকি তাহলে আমরা দেখব 100টা ফোটন কাচকে আঘাত করলে উপরের ফটোমাল্টিপ্লায়ারে 4টা ফোটন আসবে, কাচের ভেতরে যাবে 96টা! (সত্যি সত্যি এই পরীক্ষা করা হলে এক দুটো এদিক সেদিক হতে পারে কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়)।

এখন তুমি বিষয়টা চিন্তা করো, আলোর উৎস থেকে একটা ফোটন এসে কাচকে আঘাত করছে, কখনো কখনো সে ঠিক করছে উপরে প্রতিফলিত হয়ে যাবে। আবার হুবহু একই পরিবেশে কখনো কখনো সে ঠিক করছে উপরে না গিয়ে কাচের ভেতরে ঢুকে যাবে! মোটামুটি 4% সময় ফোটনটি উপরে যাবে 96% সময় নিচে যাবে—কিন্তু তুমি আগে থেকে কখনোই নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না, এটা কখন উপরে যাবে আর কখন নিচে যাবে। ফোটনটির কি নিজের একটা মস্তিষ্ক আছে? সেটা কি ভেবে ভেবে ঠিক করে কখন উপরে যাবে এবং কখন নিচে যাবে?

ব্যাপারটা আরও চমকপ্রদ করে দেওয়া যাক। মনে করো কাচটা কতটুকু পুরু হবে সেটা আমাদের হাতে আছে, অর্থাৎ আমাদের যতটুকু ইচ্ছে ঠিক ততটুকু পুরু একটা কাচ নিয়ে আমরা আমাদের পরীক্ষাটা করতে পারি (27 নং ছবি)। সত্যি সত্যি যদি এই পরীক্ষাটা করা হয় তাহলে আমরা কী দেখব?

প্রথমে আমরা অনুমান করার চেষ্টা করে দেখি আমাদের কী দেখা উচিত। আমরা দেখেছি কাচের A পৃষ্ঠ থেকে 4% ফোটন প্রতিফলিত হয়। যেহেতু ফোটনগুলো কাচের B পৃষ্ঠ থেকেও আবার প্রতিফলিত হতে পারে তাই দুটো মিলে ৪% ফোটন প্রতিফলিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যদি 100টা ফোটন একটা পাতলা কাচের উপর ফেলা হয় তাহলে আমাদের দেখা উচিত ৪টা ফোটন

প্রতিফলিত হয়ে উপরে যাচ্ছে এবং 92টা ফোটন কাচের ভেতর দিয়ে নিচে চলে যাচ্ছে।

ল্যাবরেটরিতে সত্যিকারের যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে আমরা কিন্তু সেটা দেখি না, যেটা দেখি সেটা অত্যন্ত বিচিত্র। আমরা দেখি উপরে কতগুলো ফোটন যাবে সেটা নির্ভর করে কাচ কতটুকু পুরু তার ওপর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটাও উপরে আসে না (অর্থ্যাৎ 100টাই কাচ ভেদ করে নিচে চলে যায়)। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 16 টা ফোটন উপরে চলে আসে (আর ৪4টা ফোটন যায় নিচে)! সত্যি কথা বলতে কি কাচ কতটুকু পুরু হবে সেটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে 0 থেকে 16 শতাংশ পর্যন্ত যে-কোনো পরিমাণ উপরে প্রতিফলিত করা সম্ভব। (28 নং ছবি)।

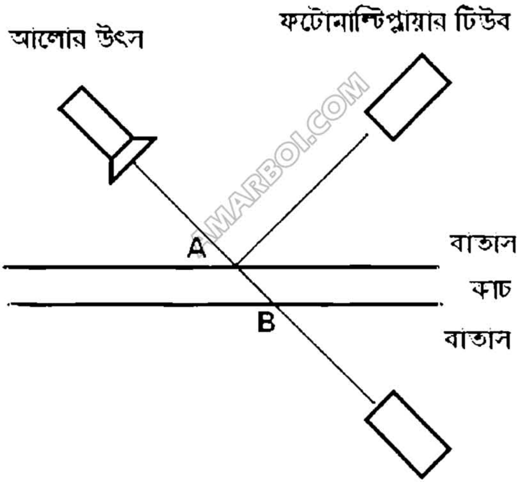

27 নং ছবি: ফোটন A বিন্দু থেকে একবার প্রতিফলিত হতে পারে এবং B বিন্দু থেকে আবার প্রতিফলিত হতে পারে।

কাচের পুরুত্ব 0 থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বাড়ানো হলে প্রতিফলিত ফোটনের সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ 16-তে পৌঁছে আবার সেটা কমতে শুরু করে, সবচেয়ে কম 0-তে পৌঁছে আবার সেটা বাড়তে থাকে। এবং এভাবে সেটা চলতেই থাকে।

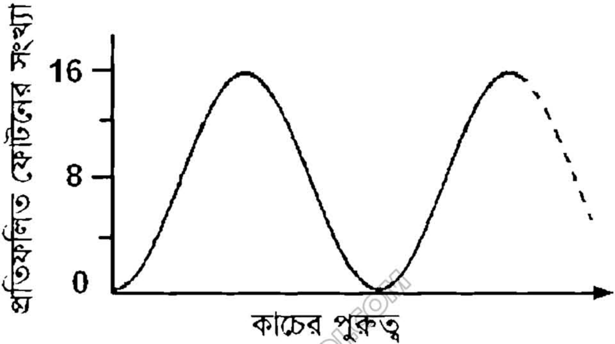

28 নং ছবি: কাচ কতটুকু পুরু তার ওপর নির্ভর করে প্রতিফলিত ফোটনের সংখ্যা 0 থেকে 16 এর ভিতরে যে-কোনো কিছু হতে পারে।

এখানে তোমাদের একটা বিষয় মনে করিয়ে দিই—আলোর কণা বা ফোটন না হয়ে যদি এটা আলোর তরঙ্গ হতো তাহলে এটা ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ হতো—আমরা বলতাম আলোর এক অংশ A থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে, একই আলোর অন্য অংশ B থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে। দুটো আলোর মাঝে ইন্টারফিয়ারেন্স হওয়ার কারণে কখনো সম্মিলিত আলো বেশি, কখনো কম।

কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে, এখানে কোনো আলোর তরঙ্গ নেই। এখানে রয়েছে আলোর কণা বা ফোটন এবং একসাথে কখনো দুটো ফোটন আসছে না, আমরা এমনভাবে আলোর তীব্রতা কমিয়ে এনেছি যে মোটামুটিভাবে একসাথে সবসময় একটা ফোটনই আসছে। সেই একটা ফোটন কখনো উপরে আসছে কখনো নিচে যাচ্ছে।

ফোটন কেন 4% এবং 4%-এর যোগফল 8% না হয়ে 0% থেকে 16% পর্যন্ত হতে পারে এর ব্যাখ্যা তুমি ভেবে ভেবে বের করতে পারবে না। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ধারণা ব্যবহার করলে এর ব্যাখ্যা একেবারে পানির মতো সোজা।

একবার ভেবে দেখো আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুরুতে কী বলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স সবসময়েই কোনোকিছু পাওয়ার বা ঘটার একটা সম্ভাবনার কথা বলে। কাচের পৃষ্ঠ থেকে আলোর প্রতিফলন সে রকম একটা ব্যাপার—এবং আমরা দেখেছি এই সম্ভাবনার মান হচ্ছে 4% বা সংখ্যায় 0.04 তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা বলেছিলাম এই সম্ভাবনা বা প্রোবাবিলিটি ফাংশন আসলে প্রোবাবিলিটি অ্যামপ্লিচুডের বা ওয়েব ফাংশনের বর্গ কাজেই কাচপৃষ্ঠ থেকে ফোটনের প্রতিফলিত হওয়ার ওয়েব ফাংশনের মান নিশ্চয়ই এই সংখ্যাটির বর্গমূল। অর্থ্যাৎ ওয়েব ফাংশন : $\sqrt{0.04} = 0.2$

ফোটন কাচপৃষ্ঠের দুই জায়গা থেকে (A এবং B) থেকে প্রতিফলিত হতে পারে। কাজেই বলা যেতে পারে এই দুটি ওয়েভ ফাংশনের মানই হচ্ছে যথাক্রমে 0.2 এবং 0.2 দুটো যোগ করলে আমরা পাই :

$$0.2 + 0.2 = 0.4$$

ওয়েভ ফাংশনের মান যদি 0.4 হয়, তাহলে প্রোবাবিলিটি ফাংশন হচ্ছে তার বর্গ :

প্রোবাবিলিটি $= (0.4)^2 = 0.16$ বা 16 শতাংশ

ঠিক যেটা আমরা দেখেছিলাম।

এখানে আমরা একটা ব্যাপার একটু ভালো করে লক্ষ করি, 0.2 এবং 0.2 এর সাধারণ যোগ হচ্ছে 0.4 কিন্তু 0.2 আর 0.2 কি অন্য কোনোভাবে যোগ করা সম্ভব যে-যোগফল অন্য কিছু হতে পারে?

হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। কেমন করে সম্ভব সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাক। ধরা যাক, তুমি এক লাফে 2 ফুট যেতে পার, দুই লাফে তুমি কতটুকু যাবে? আমার ধারণা তোমরা প্রায় সবাই বলেছ 4 ফুট—কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়। তুমি যদি প্রথম লাফ দাও সামনের দিকে, পরের লাফ দাও পিছন দিকে তাহলে দুই লাফের যোগফল হচ্ছে শূন্য (29 নং ছবি) আবার প্রথম লাফ যদি দাও, পূর্বদিকে দ্বিতীয় লাফ দাও উত্তর দিকে তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে 2.8 ফুটের কাছাকাছি। তুমি যদি প্রথম লাফটি যেদিকে দিয়েছ দ্বিতীয় লাফটিও সেই একই দিকে দাও, শুধুমাত্র তাহলেই অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে 4 ফুট।

কাজেই বুঝতেই পারছ দুই লাফ দিয়ে তুমি 0 থেকে 4 ফুট পর্যন্ত যে-কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে।

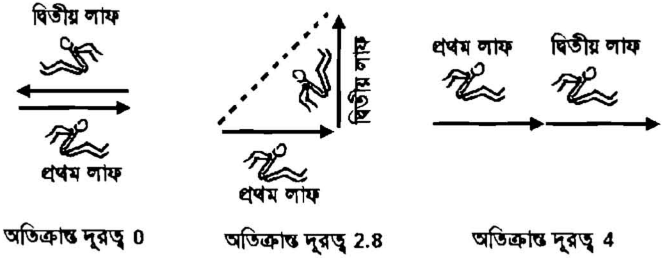

29 নং ছবি: প্রথম ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব 0 ফুট, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 2.8 ফুটের মতো এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে 4 ফুট।

কাজেই কাচপৃষ্ঠের প্রতিফলনের বেলায় যে-দুটি ওয়েভ ফাংশন তৈরি হয়েছে সেই দুটোর বেলাতেও এই কথাটি সত্যি, এদের দুটোর মান 0.2 কিন্তু এই দুটি একত্র হয়ে এটা 0 থেকে 0.4 পর্যন্ত যে-কোনো মান তৈরি করতে পারবে (30 নং ছবি) মানটা কত হবে ওটা নির্ভর করে দুটো ওয়েভ ফাংশানের পরস্পরের ভেতর সম্পর্কের মাঝে।

আমরা একবার যদি সম্মিলিত ওয়েভ ফাংশনের মান পেয়ে যাই তাহলে প্রোবাবিলিটি বের করা পানির মতো সোজা, তার জন্যে ওয়েভ ফাংশনকে শুধুমাত্র বর্গ করতে হবে।

14. সবকিছুর সাথে তরঙ্গ

আমরা আগেই বলেছি যে, সবকিছুর সাথেই একটা তরঙ্গ থাকে—তাহলে কি তোমার সাথেও একটা তরঙ্গ আছে?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তোমার সাথেও একটা তরঙ্গ আছে। শুধু তোমার সাথে নয়, তোমার আশপাশে যা-কিছু আছে তার সবকিছুর সাথেই একটা তরঙ্গ

আছে। লুই ডি ব্রগলি সবার আগে সেটা বলেছিলেন, তাঁর ভাষায় যদি কোনোকিছুর ভরবেগ হয় p তাহলে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ হবে :

$$\lambda=\frac{h}{p}$$

এখানে h হচ্ছে আমাদের পরিচিত প্লাঙ্কের ধ্রুব। বিষয়টা ভালো করে অনুভব করার জন্যে ধরা যাক, তোমার ওজন 40kg এবং তুমি ঘণ্টায় 10km বেগে হাঁটছ, তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?

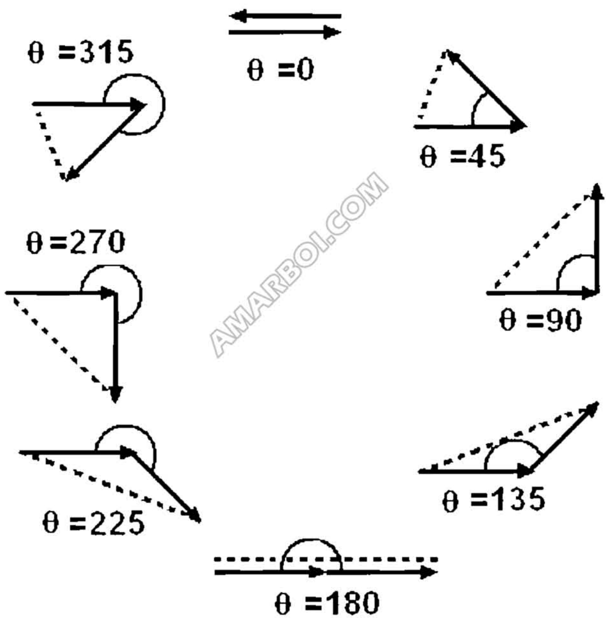

30 নং ছবি: দুটো 0.2 দৈর্ঘ্যকে একত্র করে 0 থেকে 0.4 পর্যন্ত যে-কোনো দৈর্ঘ্য তৈরি করা সম্ভব। মোট দৈর্ঘ্য কত হবে সেটা নির্ভর করে দুটো দৈর্ঘ্য একটা আরেকটার সাথে কত ডিগ্রি কোণ করে আছে তার উপর।

ঘণ্টায় 10km-কে আমরা লিখতে পারি :

$$\frac{10 \times 10^3 \mathrm{m}}{60 \times 60 \mathrm{s}} = 2.78 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

কাজেই তোমার ভরবেগ :

$$p = (40\mathrm{kg})\ (2.78 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}) = 111.11\ \mathrm{kg\text{-}m/s}$$

তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য :

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34}\ \ \mathrm{J.s}}{111.11 \mathrm{kg\ m/s}} \sim 6.0 \times 10^{-36}\ \mathrm{m}$$

কথায় যদি এটা বলতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে 6 মিটারের ট্রিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন ভাগের এক ভাগ। সেটা এত ছোট যে, এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোনোকিছু দেখার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

কাজেই যদিও সবকিছুর সাথেই একটা তরঙ্গ থাকে—সেটা যে সবসময়েই আমাদের জীবনে কোনো-একটা প্রভাব ফেলবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোয়ান্টাম মেকানিক্স হচ্ছে অণু-পরমাণুর ক্ষুদ্র জগতের পদার্থবিজ্ঞান। আমাদের চারপাশের পরিচিত যে-জগৎ সেই জগতে আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কোনো প্রমাণ খুঁজে পাই না। আমরা যখন অণু-পরমাণুর জগতে যাই, যখন বস্তুর আকার, আকৃতি, ভর, ভরবেগ প্লাঙ্কের ধ্রুবের সাথে তুলনার পর্যায়ে চলে আসে তখন হঠাৎ করে কোয়ান্টাম মেকানিক্স স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

15. অনিশ্চয়তার সূত্র

আমরা যদি লুই ডি ব্রগলির সূত্রটা মেনে নিই তাহলে অনিশ্চয়তার সূত্র নামে (uncertainity principle) কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সবচেয়ে চমকপ্রদ সূত্রটা কেমন করে এসেছে সেটা বুঝতে পারব। আমরা এর মাঝে বলে ফেলেছি যে, সবকিছুর সাথেই একটা তরঙ্গ থাকে এবং সেটা হচ্ছে ওয়েভ ফাংশন, ওয়েভ ফাংশনের বর্গ করলে কোনোকিছু কোথায় পাওয়া যাবে তার সম্ভাবনাটা বের করা যায়।

ধরা যাক 31 নং ছবিতে দুটো কণার ওয়েভ ফাংশনটা দেখানো হয়েছে। উপরের ওয়েভ ফাংশনটি দেখিয়ে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি এই কণাটির অবস্থান সম্পর্কে তুমি কী জান? তুমি নিশ্চয়ই বলবে, "মোটামুটি ভালোই জানি।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদের শিখিয়েছে কোনোকিছুই আর নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় শুধুমাত্র সম্ভাবনার কথা বলা যায়। তাই আমি বলছি কণাটি Δx_1 এর ভেতরে কোথাও পাওয়া যাবে।"

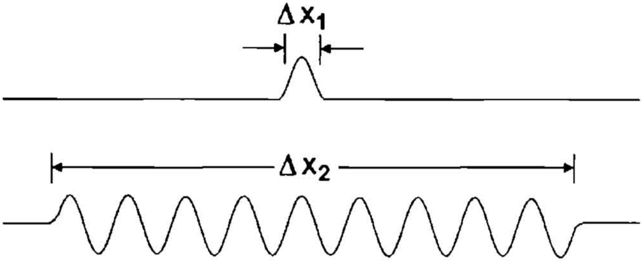

31 নং ছবি: দুটি কণার ওয়েভ ফাংশন। উপরের কণাটি কোথায় আছে আমরা মোটামুটি জানি। কারণ Δx_1 এর মান ছোট। নিচের ওয়েভ ফাংশনে কণাটি কোথায় আছে খুব ভালো করে জানি না। কারণ Δx_2-এর মান অনেক বড়।

এবারে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় এই কণাটির ভরবেগ কত, তুমি নিশ্চয়ই এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলে ফেলতে পারবে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটি জানা থাকলেই ভরবেগ বের করতে পারব, কারণ ভরবেগ $p = h/\lambda$। তার পরেই তুমি কণাটির ভরবেগ মাপতে গিয়ে একটা সমস্যার মাঝে পরে যাবে, কারণ ওয়েভ ফাংশনের যেটুকু দেওয়া আছে সেটা থেকে পুরো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করা সহজ নয়। অনুমান করে যদি বের করেও ফেলো মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় তার মাঝে ভুল—ভ্রান্তি থাকবে। অর্থাৎ কণাটির অবস্থান মোটামুটি নিখুঁতভাবে বলা গেছে এবং সে-কারণেই ভরবেগটা নিখুঁতভাবে বলা যাচ্ছে না।

এবারে নিচের ছবিতে যে ওয়েভ ফাংশন রয়েছে সেটা দেখিয়ে তোমাকে যদি প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয় কণাটির ভরবেগ কত? তুমি মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলবে ভরবেগ এবারে বেশ নিখুঁতভাবে বলা যাবে, কারণ এবারে আগের বারের মতো দুরবস্থা নেই, Δx_2 দূরত্বের মাঝে অনেকগুলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। কাজেই বেশ নিখুঁতভাবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা মাপা যাবে। আর নিখুঁতভাবে যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ মাপা যায় তাহলে নিখুঁতভাবে ভরবেগ বের করা যাবে। কারণ ভরবেগ p হচ্ছে h/λ।

এবারে যদি তোমাকে বলা হয়, কণাটির অবস্থানটি কোথায়, নিশ্চিতভাবেই তুমি মাথা চুলকাবে। কারণ এবারে Δx_2, Δx_1-এর মতো ছোট নয়, বেশ বড়। কাজেই কণাটির অবস্থান এই Δx_2 এর ভেতরে যে-কোনো জায়গায় হতে পারে। অর্থাৎ তুমি যেহেতু ভরবেগটা মোটামুটি নিখুঁতভাবে বের করেছ এবং এ-কারণেই অবস্থান সম্পর্কে তোমার তথ্যটা অনিশ্চিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ একটা কণার অবস্থান আর ভরবেগের মাঝে একটা রহস্যজনক সম্পর্ক, একটা ভালো করে জানলেই অন্যটার মাঝে অনিশ্চয়তা ঢুকে যায়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনোটাই একেবারে নিখুঁতভাবে বলা সম্ভব নয়। এটাই হচ্ছে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র এবং তিনি সেটা অনেক সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন। তাঁর ভাষায় বলা যায় কোনোকিছুর অবস্থান মাপার সময় যদি অনিশ্চয়তার পরিমাণ হয় Δx এবং সেই একই বস্তুর ভরবেগ মাপার সময় যদি তার অনিশ্চয়তা হয় Δp তাহলে

$$\Delta x \, \Delta p > h$$

বিষয়টা আরও পরিষ্কার করে বলে দেয়া যাক। Δx, Δp কিন্তু x বা p-এর মান নয়, x এবং p-এর মান বের করতে গিয়ে যেটুকু অনিশ্চয়তা থাকতে পারে তার মান। অর্থ্যাৎ x সুনির্দিষ্টভাবে মাপা হলে $\Delta x = 0$ এবং p সুনির্দিষ্টভাবে মাপা হলে $\Delta p = 0$

কাজেই আমরা যদি কোনো বস্তুর অবস্থানটা অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বের করতে পারি অর্থাৎ তার অবস্থানে কোনো অনিশ্চয়তা নেই বা $\Delta x \cong 0$ তাহলে

$$\Delta p > \frac{h}{\Delta x} \cong \frac{h}{0} \to \infty$$

অর্থাৎ $\Delta p \to \infty$, যার অর্থ বস্তুটির ভরবেগের অনিশ্চয়তা এতো বেশি যা তার প্রকৃত ভরবেগ সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

আবার আমরা যদি কোনোভাবে তার ভরবেগটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে মাপতে পারতাম যেন সেখানে কোনো অনিশ্চয়তা না থাকে, অর্থাৎ $\Delta p \cong 0$ তাহলে-

$$\Delta x > \frac{h}{\Delta p} \cong \frac{h}{0} \to \infty$$

অর্থাৎ Δx এত বেশি যে, বস্তুটির অবস্থান সম্পর্কে এখন আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

আমরা বেশ কয়েকবার বলেছি যে, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগৎ হচ্ছে ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর জগৎ। আমাদের চারপাশের পরিচিত জগৎ অনেক বড় তাই সেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের রহস্যময় ব্যাপারগুলো দেখি না।

প্লাঙ্কের ধ্রুব h-এর মান অনেক ছোট। তাই আমাদের পরিচিত জগতে একটা বস্তুর অবস্থান আর ভরবেগ যথেষ্ট নিখুঁতভাবে বের করতে পারি। নিউটনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্র শেখার পরপরই আমরা বস্তুর সরন, বেগ বের করা শুরু করে দিই, কখনো আপত্তি করে বলি না সরণ (বা অবস্থান) বের করলে বেগ (বা ভরবেগ) বের করতে পারব না, কোয়ান্টাম মেকানিক্স সেটা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স একই সাথে অবস্থান এবং ভরবেগ চূড়ান্তভাবে বের করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সত্যি কিন্তু সেটা h-এর অতি ক্ষুদ্র জগতে।

যদি h-এর মান এত বেশি হতো যে সেটা আমাদের পরিচিত জগতে প্রভাব ফেলতে শুরু করত তাহলে ভয়ংকর সব ব্যাপার ঘটতে শুরু করত। ধরা যাক তুমি স্টেশনে গিয়েছ ট্রেন ধরতে। ট্রেনটা যখন স্টেশনে থামল তখন তার বেগ হচ্ছে শূন্য, ভরবেগও শূন্য। অর্থাৎ তার ভরবেগটা আমরা নিশ্চিতভাবে জেনে গেছি যার অর্থ ট্রেনটায় অবস্থান আমাদের কাছে পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে যাবে। ট্রেনটা ঢাকা নাকি ভৈরব নাকি সিলেট আমরা কিছুই জানব না।

আবার তুমি যদি ট্রেনে ওঠার জন্যে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং যখন সেটা ঠিক তোমার সামনে আসবে তখনই ট্রেনে উঠতে যাও তাহলেও মহাবিপদে পড়বে। কারণ ট্রেনটা যখন ঠিক তোমার সামনে এসে হাজির হবে তখন তুমি ট্রেনের অবস্থান নিশ্চিতভাবে জান, যার অর্থ ট্রেনটার ভরবেগ (কাজেই তার বেগ) পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে যাবে। ট্রেনটা দাঁড়িয়েও থাকতে পারে, অচিন্তনীয় বেগে ছুটেও যেতে পারে, সেটা সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না।

তবে আমাদের জন্যে সেটা সমস্যা হয় না, h-এর মান খুব ছোট, তাই শুধু অণু-পরমাণুকে অনিশ্চয়তার সূত্র নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়—আমাদের মাথা ঘামাতে হয় না।

16. পর্যবেক্ষণ

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে শক্তি নিরবচ্ছিন্ন নয়, শক্তি বিচ্ছিন্ন, কোয়ান্টার মতো, যে কারণে কোয়ান্টাম মেকানিক্স নামটি এসেছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে প্রোবাবিলিটি অ্যামপ্লিচুড। নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব না, সবকিছুরই শুধুমাত্র একটা সম্ভাবনা

থাকে এবং সেই সম্ভাবনাটুকু বোঝা যায় প্রোবাবিলিটি ফাংশান থেকে। প্রোবাবিলিটি অ্যামপ্লিচুডকে বর্গ করা হলে প্রোবাবিলিটি ফাংশান পাওয়া যায়।

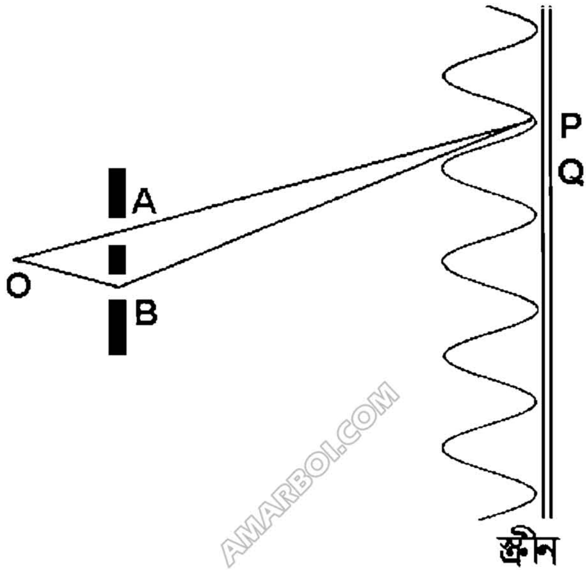

32 নং ছবি: O থেকে শুরু করে আলোর একটা রশ্মি A স্লিট দিয়ে P বিন্দুতে পৌঁছে। একইভাবে আলোর অন্য একটি রশ্মি O থেকে শুরু করে B স্লিট দিয়ে P বিন্দুতে পৌঁছে। OAP এর তুলনায় OBP রশ্মিটিকে একটু বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে। তাই সেটি একটু পিছিয়ে গিয়েছে এবং P বিন্দুতে ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স হয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্য কমে গিয়েছে।

এবারে আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তৃতীয় বিষয়টা নিয়ে কথা বলব, যেটা প্রথম দুটি বিষয় থেকে কোনো অংশে কম বিচিত্র নয়। বিষয়টা ব্যাখ্যা করার জন্যে আমরা একটা বিখ্যাত পরীক্ষা দিয়ে শুরু করি। সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানী ইয়ংয়ের ডাবল স্লিট পরীক্ষা। ইয়ং সেটা করেছিলেন আলো দিয়ে, আমরা এখন জানি আলোর কণা বা ফোটন আর ইলেকট্রন দুইয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। দুটিই কণা, দুইয়ের সাথেই একটা ওয়েভ ফাংশন বা তরঙ্গ থাকে। কাজেই এই

এক্সপেরিমেন্টটা আমরা আলো দিয়ে করি আর ইলেকট্রন দিয়েই করি ফলাফলে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

এবার তাহলে ইয়ংয়ের মূল এক্সপেরিমেন্টটার বর্ণনা দেওয়া যাক। এটা করতে হয় একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে সেটি দুটো সরু স্লিটের (Slit বা ফুটোর) ভেতর দিয়ে গিয়ে পেছনে একটা স্ক্রিনে পড়ে (32 নং ছবি)। এটি খুব সহজ একটা এক্সপেরিমেন্ট, ল্যাবরেটরিতে খুব সহজে করা যায় এবং করা হলে স্ক্রিনে আলোর ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যেতে এবং কমে যেতে দেখা যায়। আলোর তরঙ্গ দিয়ে এটা খুবই সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। তখন বলতে হয় আলোর তরঙ্গের একটা অংশ O থেকে শুরু করে A স্লিটের ফুটোর ভেতর দিয়ে P বিন্দুতে পৌঁছেছে। (অনেকে প্রশ্ন করতে পারে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে OAB সরলরেখা, আলো সরলরেখায় যায়, কাজেই এটা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু OBP মোটেই সরলরেখা নয়, আলো কেমন করে এই পথে গেল? আসলে A ও B স্লিটে দুটো খুবই সরু, আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকেও সরু, এরকম স্লিটের ভেতর দিয়ে যেতে হলে কল্পনা করতে হবে A এবং B স্লিটে পৌঁছানোর পর সেই বিন্দু থেকে আলো আবার নতুন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে করতে হবে A ও B স্লিট দুটোই যেন আলোর উৎস। তরঙ্গের এটি আরেকটি ধর্ম।)

যাই হোক আমরা যদি OAP এবং OBP এই দুটো পথ তুলনা করি তাহলে দেখব OBP পথটা OAP পথ থেকে একটু বেশি লম্বা। কাজেই একটা তরঙ্গ যদি একই সময়ে রওনা দেয় তাহলে OBP পথে যাওয়ার কারণে সেটা একটু পিছিয়ে পড়বে। যদি এটা ঠিক অর্ধেক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পিছিয়ে যায় তাহলে যখন দুটো আবার মিলিত হবে তখন দুটো তরঙ্গ একটা আরেকটাকে ধ্বংস করে দেবে। আমরা জানি এটার নাম ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স এবং এর কারণে P বিন্দুটি সব সময়েই অন্ধকার থাকবে। ঠিক সেভাবে Q বিন্দুতে দুটো রশ্মি যখন পৌঁছেছে তখন তাদের দূরত্বের পার্থক্য পুরো একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (কিংবা পুরো দুটি কিংবা তিনটি)। কাজেই সেখানে গঠনমূলক ইন্টারফিয়ারেন্স হয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যাবে।

কাজেই স্ক্রিনে আমরা আলোর ঔজ্জ্বল্য বেশি কম বেশি কম এভাবে দেখতে (33 নং ছবি) পাব। ইয়ংয়ের দুই স্লিট পরীক্ষাটা তরঙ্গের খুবই বড় একটা প্রমাণ এবং এটা যে-কোনো তরঙ্গ দিয়েই করা যায়। 34 নং ছবিতে এটাকে পানির তরঙ্গ দিয়ে করে দেখানো হয়েছে—যেখানে ধ্বংসাত্মক ইন্টারফিয়ারেন্স হয়েছে এবং সেখানে গঠনমূলক ইন্টারফিয়ারেন্স হয়েছে সেই জায়গাগুলো এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এতটুকু ছিল ভূমিকা—এখন আসল কথায় আসি। আলোর দুই অংশ একটার সাথে আরেকটা ইন্টারফিয়ারেন্স করতেই পারে—কিন্তু যদি এটা আমরা কণা হিসেবে দেখি? তোমাদের মনে প্রথমেই যে-সম্ভাবনার কথা মনে হবে সেটি হচ্ছে, এখন আলোর দুটি কণার একটি যাবে OAP পথে, অন্যটি যাবে OBP পথে এবং দুটো একটার সাথে আরেকটা ইন্টারফিয়ার করবে। কিন্তু সেটা সত্যি উত্তর নয়, কারণ যদি আমরা এমনভাবে পরীক্ষাটা করি যেন কোনোভাবেই একসাথে দুটো ফোটন না যায় তাহলেও আমরা কিন্তু 33 নং ছবির মতো আলোর ঔজ্জ্বল্যের প্যাটার্নটা দেখতে পাব। (এই প্যাটার্নটা দেখার জন্য স্ক্রিনের জায়গায় একটা ফটোগ্রাফের প্লেট রাখতে হবে, তাহলে সেখানে ধীরে ধীরে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।)

33 নং ছবি: ইয়ংয়ের দুই স্লিটের পরীক্ষা

তাহলে আমরা কেমন করে ব্যাখ্যা করব? তরঙ্গ হিসেবে ধরে নিলে ব্যাপারটা খুবই সহজ, কিন্তু আমরা তো এটাকে তরঙ্গ হিসাবে ধরতে পারছি না—আমাদের এটাকে কণা হিসেবে ধরতে হবে। কণার সাথে একটা ওয়েভ ফাংশন বা তরঙ্গ থাকতে পারে সত্যি—কিন্তু সেটা তো 'একটা' তরঙ্গ। ইন্টারফিয়ারেন্স হওয়ার জন্যে দুটি তরঙ্গের (34 নং ছবি) প্রয়োজন—এখানে দুটি তরঙ্গ কোথা থেকে আসবে?

এখন আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তৃতীয় বিষয়টি বলতে পারি। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে, ফোটন (বা ইলেকট্রন) যখন দুটি স্লিটের ভেতর দিয়ে যায় তখন সেটা হয়তো কখনো A স্লিটের ভেতর দিয়ে আবার কখনো B স্লিটের ভেতর দিয়ে যায়। কাজেই আমরা ধরে নেব যখন একটা ফোটন যাচ্ছে তখন তার ভেতরে A ফুটো দিয়ে যাবার খানিকটা সম্ভাবনা অ্যামপ্লিচুড থাকবে, ঠিক সেরকম B ফুটো দিয়ে যাবারও খানিকটা সম্ভাবনা অ্যামপ্লিচুড থাকবে। কাজেই মূল ওয়েভ ফাংশনের হবে দুটো অংশ, একটা অংশ A-এর ভেতর দিয়ে যাবার জন্যে

আরেকটা অংশ B এর ভেতর দিয়ে যাবার জন্যে। যদি আমরা তাদের Ψ_A আর Ψ_B দিয়ে লিখি তাহলে মূল ওয়েভ ফাংশন Ψ (উচ্চারণ শাই) হচ্ছে:

$$\Psi = \Psi_A + \Psi_B$$

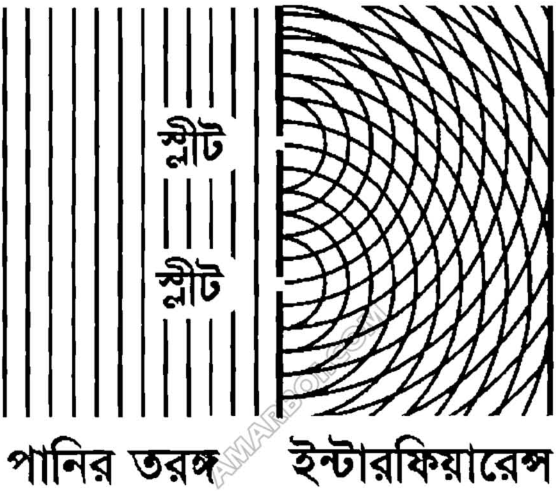

34 নং ছবি: পানির তরঙ্গ দিয়ে দুই স্লিটের পরীক্ষা

তোমরা দেখতে পাচ্ছ, শেষ পর্যন্ত ইন্টারফিয়ারেন্সের জন্যে দুটি তরঙ্গ পাওয়া গেছে—এই দুটি তরঙ্গ এখন একে অপরের সাথে ইন্টারফিয়ারেন্স করবে এবং আমরা আমাদের ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্নটা পেয়ে যাব। মনে রাখতে হবে সম্ভাবনা অ্যামপ্লিচুড কিন্তু সম্ভাবনা না, এটাকে বর্গ করা হলে তখন সত্যিকার সম্ভাবনা পাওয়া যায়। তাই স্ক্রিনের কোনো-একটা বিন্দুতে একটা ফোটন কিংবা একটা ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা কত সেটা বের করার জন্যে আমাদের সম্ভাবনা অ্যামপ্লিচুডের বর্গ নিতে হবে। অর্থাৎ

$$|\Psi|^2 = |\Psi_A|^2 + |\Psi_B|^2 + 2\Psi_A \times \Psi_B$$

যদি Ψ_A এবং Ψ_B-এর জন্যে সত্যিকার তরঙ্গ নিয়ে হিসেব করো, দেখবে সত্যি সত্যি এটা চমৎকার ইন্টারফিয়ারেন্সের প্যাটার্ন দেখাচ্ছে।

আমি নিশ্চিত তোমাদের মাঝে কেউ-কেউ ভ্রূ কুঁচকে ফেলেছ এবং বলছ, কিন্তু ফোটন বা ইলেকট্রন হচ্ছে কণা। একটা কণা কখনই দুই টুকরো হয়ে এক ভাগ A স্লিট দিয়ে অন্যভাগ B স্লিট দিয়ে যেতে পারে না—কাজেই আমাদের

$\Psi = \Psi_A + \Psi_B$

লেখাটা ভুল হয়েছে। আমাদের লেখা উচিত

হয় $\Psi = \Psi_A$ না হয় $\Psi = \Psi_B$

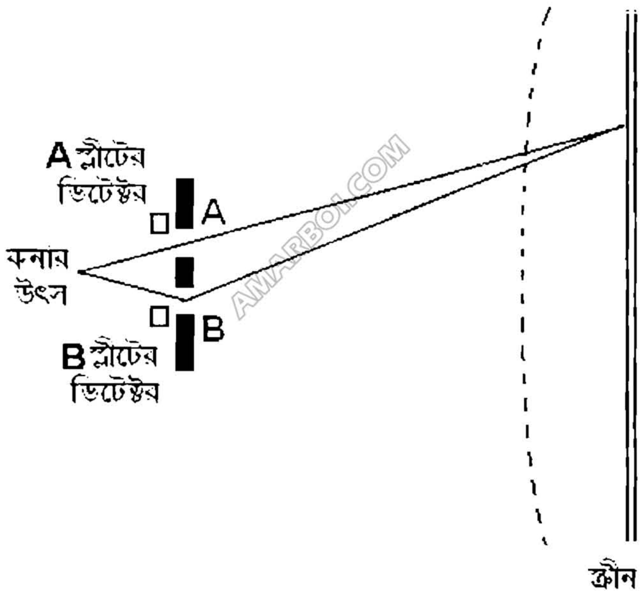

৩৫ নং ছবি: A এবং B স্লিটে ডিটেক্টর বসানো হয়েছে এবং কণাটি A কিংবা B স্লিট দিয়ে গেলে সেটি আগে থেকে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে।

যার অর্থ কণাটা হয় Ψ_A দিয়ে যাবে নাহয় Ψ_B দিয়ে যাবে। তোমরা হয়তো আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলবে, আমরা অনুমানের উপর ছেড়ে দেব না এবং A এবং B স্লিটের মাঝে ছোট ছোট কোনো-এক ধরনের ডিটেক্টর বসিয়ে রাখব এবং সেই ডিটেক্টর আগে থেকে বলে দেবে কণাগুলো A স্লিট দিয়ে যাচ্ছে নাকি B স্লিট দিয়ে যাচ্ছে।

আমরা যদি এরকম একটা প্রস্তুতি নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করি তাহলে আমরা হতভম্ব হয়ে যাব, তার কারণ আমরা হঠাৎ করে আবিষ্কার করব কণাগুলো আর নিজেদের ভেতর ইন্টারফিয়ারেন্স করছে না। আমরা মোটামুটি সমান ঔজ্জ্বল্যের একটা প্যাটার্ন পাব। ব্যাপারটা একটা লুকোচুরি খেলার মতো, ইন্টারফিয়ারেন্স করার জন্যে A এবং B দুটি ফুটো দিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকা দরকার। যখন আমরা নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছি যে এটা হয় A নাহয় B দিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা আর ইন্টারফিয়ারেন্স করছে না। কাজেই স্ক্রিনে আলো বা ইলেকট্রনের কণা পাওয়ার সম্ভাবনা P হচ্ছে A তে কণা পাওয়ার সম্ভাবনা এবং B-তে কণা পাওয়ার সম্ভাবনার যোগফল। A তে কণা পাওয়ার সম্ভাবনা $|\Psi_A|^2$ এবং B-তে কণা পাওয়ার সম্ভাবনা $|\Psi_B|^2$ কাজেই

$$P = |\Psi_A|^2 + |\Psi_B|^2$$

দুটি তরঙ্গকে যোগ করে বর্গ করা হলে ইন্টারফিরায়েন্স হয় কিন্তু বর্গ করে নিয়ে যোগ করা হলে তার মাঝে কোনো ইন্টারফিয়ারেন্স থাকে না। ব্যাপারটা আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারি, ধরা যাক আমাদের Ψ_A হচ্ছে :

$$\Psi_A = \sin(kx_1 - \omega t)$$
$$\Psi_B = \sin(kx_2 - \omega t)$$

যেখানে x_1 হচ্ছে 31 নং ছবিতে OAP এর দূরত্ব, x_2 হচ্ছে OBP এর দূরত্ব এবং $k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi v/\lambda$

আমরা লিখতে পারি $x_1 = x_0 - \Delta$ এবং $x_2 = x_0 + \Delta$

কাজেই : $\Psi_A = \sin(kx_0 - k\Delta - \omega t)$

$$\Psi_B = \sin(kx_0 + k\Delta - \omega t)$$

দুই জায়গাতেই kx_0 আছে, যার অর্থ এটা Ψ_A এবং Ψ_B-কে সমান পরিমাণ দশা (phase) দিয়েছে। এটাকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারি। (কেউ যদি খুঁতখুঁত করে তাহলে বলতে পারি আমরা স্ক্রিনটাকে সামনে পিছনে এনে $kx_0 = 2n\pi$ তৈরি করে ফেলতে পারি যেখানে n=1, 2, 3. !)

সুতরাং

$\Psi_A = -\sin(k\Delta + \omega t)$

$\Psi_B = \sin(k\Delta - \omega t)$

এবারে প্রথমে আমরা দুটি ওয়েভ ফাংশান যোগ করে বর্গ করি। তাহলে পাব: $|\Psi|^2 = |\Psi_A + \Psi_B|^2 = |-\sin(k\Delta + \omega t) + \sin(k\Delta - \omega t)|^2$

$= |-\sin k\Delta\cos\omega t - \cos k\Delta\sin\omega t + \sin k\Delta\cos\omega t - \cos k\Delta\sin\omega t|^2$

$= 2\cos^2 k\Delta\sin^2 \omega t$

আমরা যদি দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষাটি করি তাহলে $\sin^2 \omega t$ -এর গড় মান হয়ে যায় 1/2

কাজেই $|\Psi|^2 = \cos^2 k\Delta$

এটা পরিষ্কার ইন্টারফিয়ারেন্সের প্যাটার্ন।

এবারে আমরা আগে বর্গ করে পরে যোগ করি।

$|\Psi|^2 = |\Psi_A|^2 + |\Psi_B|^2$

$= |-\sin(k\Delta + \omega t)|^2 + |\sin(k\Delta - \omega t)|^2$

$= |\sin k\Delta\cos\omega t + \cos k\Delta\sin\omega t|^2 + |\sin k\Delta\cos\omega t - \cos k\Delta\sin\omega t|^2$

$= 2\sin^2 k\Delta\cos^2 \omega t + 2\cos^2 k\Delta\sin^2 \omega t$

আবার আমরা যদি দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষাটি করি তাহলে $\sin^2 wt$ এবং $\cos^2 \omega t$ উভয়ের গড় মান হবে 1/2

তাহলে আমরা পাই $|\Psi|^2 = \sin^2 k\Delta + \cos^2 k\Delta$

$= 1$

যেটি অপরিবর্তনশীল, নিঃসন্দেহে ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন নয়। (কমপ্লেক্স সংখ্যা ব্যবহার করে এই পুরো ব্যাপারটি অনেক সহজে পরিশিষ্টে দেখানো হয়েছে।)

ব্যাপারটাকে কেউ যেন ম্যাজিক মনে না করে—আমরা এখন পর্যন্ত যেটুকু কোয়ান্টাম মেকানিক্স শিখেছি সেটা দিয়েই কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সবার নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্রের কথা বলেছিলাম? সেই সূত্রটি এই ব্যাপারটি ঘটিয়েছে। আমরা যখন খুব ছোট ডিটেক্টর দিয়ে কণাটি A স্লিট নাকি B স্লিট দিয়ে যাচ্ছে সেটা বের করার চেষ্টা করেছি তখন নিজের অজান্তেই একটা ঝামেলা করে ফেলেছি। যদি আমরা নিশ্চিতভাবে জানি এটা A স্লিটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা তার অবস্থানটা নির্দিষ্ট করে জেনে

যাচ্ছি—সাথে সাথে তার ভরবেগ অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে—কণাটি তখন সামনের স্ক্রিনের যে-কোনো জায়গায় এসে আঘাত করতে পারে। (ছবিতে দেখানো হয়েছে স্লিটটা উপরে-নিচে, অবস্থানটাও উপরে-নিচে, তাই ভরবেগের উপরে-নিচের নিচের অংশটুকু অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে) যদি কণাগুলোর কোনটি কোথায় এসে আঘাত করবে তার কিছুই না জানি তাহলে আমরা ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্নটা কেমন করে পাব?

তাহলে এতক্ষণ যে-বিষয়টা বলা হয়েছে সেগুলো এবারে একটু গুছিয়ে বলা যাক। আমার মনে হয় সবার কাছেই মনে হবে বিষয়টা যথেষ্ট বিচিত্র। এখানে আমরা A বিন্দু কিংবা B বিন্দু দিয়ে যাবার কথা বলেছি—এটা আর অন্য কিছুও হতে পারত। একটি পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হতে পারত, পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন শক্তি হতে পারত—ইলেক্ট্রনের ভিন্ন ভিন্ন কৌণিক ভরবেগ (spin) হতে পারত—আমরা সেগুলোকে যদি সাধারণ ভাষায় 'অবস্থা' (ইংরেজিতে State) বলি। এবার তাহলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সেও তৃতীয় বিষয়টি বলা যাক:

একটা ওয়েভ ফাংশন কোনোকিছুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সম্মিলিত রূপ হিসেবে থাকে। আসলে তা কোন অবস্থায় আছে সেটি কেউ জানে না। সেটা জানা যায় শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করা হলে। যদি কোনোরকম পর্যবেক্ষণ করা হয় শুধুমাত্র তাহলেই এটা নির্দিষ্ট কোনো-একটা অবস্থায় যায়—পর্যবেক্ষণ করার আগে পর্যন্ত এটার নির্দিষ্ট কোনো অবস্থা নেই—তখন সব অবস্থাই সম্ভব। কোন অবস্থা (state) এর সম্ভাবনা বেশি কোনটা কম এটুকুই শুধু জানা সম্ভব।

17. কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ব্যবহার

আমরা এবারে একটু কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করি। যারা এতক্ষণ মন দিয়ে পড়ে এসেছে তারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগতে ওয়েভ ফাংশনের একটা গুরুত্ব আছে। আমরা যদি কোনোকিছুর ওয়েভ ফাংশনটি জানি তাহলে তার সম্পর্কে যেটুকু জানা সম্ভব তার সবটুকু জেনে যাব।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সে সেই ওয়েভ ফাংশনের একটা সমীকরণ আছে, বিজ্ঞানী শর্ডিংগার সেই সমীকরণটি লিখেছিলেন এবং যারা কোয়ান্টাম মেকানিক্স শেখে তাদের সবাই সেই সমীকরণটি সমাধান করতে শেখে এবং তার থেকে চমকপ্রদ সব উত্তর বের হয়ে আসে। পরিশিষ্টে সেই সমীকরণটি দেওয়া আছে, তার সমাধানও দেওয়া আছে। কিন্তু এখানে আমরা সেটার সমাধান না করেই যেটুকু তথ্য বের করা সম্ভব সেটা বের করে নেব।

ওয়েভ ফাংশনের সেই সমীকরণের সমাধান বের করার সময়ে যে-কণা বা বস্তুর ওয়েভ ফাংশন বের করতে যাই তার শক্তির কথাটি বারবার চলে আসে—কাজেই সেই বিষয়টা আমরা আরও একবার ঝালাই করে নিই। 20 নং ছবিতে আমরা একটা গর্তের মাঝে আটকে-পড়া একটা মার্বেল দেখিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম মার্বেলটির গতিশক্তি যদি যথেষ্ট হয় তাহলে সে গর্ত থেকে বের হয়ে আসবে। 36 নং ছবিতে ব্যাপারটা আবার দেখানো হয়েছে। একটা গর্তের মাঝে একটা মার্বেল আটকা পড়ে আছে এবং তার গতিশক্তি যদি গর্তের সমান পরিমাণ স্থিতিশক্তি বা পটেন্সিয়ালের সমান কিংবা বেশি হয় তাহলে সেটা গর্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। যদি শক্তি কম হয় তাহলে কখনো গর্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।

একটা ক্ষুদ্র কণার জন্যেও আমরা একই ধরনের অবস্থা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু তখন আমরা আর 'গর্ত' বা 'মার্বেল' না বলে বলি একটা পটেন্সিয়াল কূপ। 36 নং ছবিতে এরকম একটা পটেন্সিয়াল কূপ দেখানো হয়েছে, আগেরটার সাথে তুলনা করে আমরা বলতে পারি, যদি এই কূপের মাঝে কোনো কণার শক্তি E, কূপের গভীরতা V_0 থেকে বেশি হয় তাহলে সেটা মুক্ত অবস্থায় কূপের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় এর শক্তি V_0 থেকে কম তাহলে এটা কূপের মাঝে আটকা পড়ে থাকবে।

আমরা এই পটেন্সিয়াল কূপে আটকে থাকার ব্যাপারটিতে আবার ফিরে আসব, আপাতত আমরা একটা তুলনামূলক সহজ সমস্যায় যাই, যেখানে কূপের দেয়ালটির মান V_0 হচ্ছে অসীম। যার অর্থ এর ভেতরে যে-কণা রয়েছে তার শক্তি যতই হোক না কেন এটা চিরদিনের জন্যেই ভেতরে আটকা পড়ে থাকবে।

আমরা ইচ্ছে করলেই শর্ডিংগার সমীকরণ ব্যবহার করে এর সমাধান বের করতে পারি, পরিশিষ্টে সেটা দেখানো আছে, আমরা সেটাতে না গিয়ে সরাসরি তার সমাধানে চলে যেতে পারি। 37 নং ছবিতে বামদিকে এরকম একটি কণার ওয়েভ ফাংশন এবং ডানদিকে তার প্রোবাবিলিটি ফাংশন দেখানো হয়েছে। বাম দিকের ছবিটি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে সমাধানটি এসেছে নির্দিষ্ট কিছু শক্তি E_0, E_1, E_2, E_3 ইত্যাদি জন্যে। E_0 এবং E_1 এর মাঝখানে কিংবা E_1 এবং E_2-এর মাঝখানে কোনো সমাধান নেই। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুরুতে আমরা এটা বলেছিলাম, শর্ডিংগারের সমীকরণ সমাধান করলে আমরা সরাসরি এটা পেয়ে যাই। 37 নং ছবির ডান পাশে প্রোবাবিলিটি ফাংশন বা কণাটিকে কোথায় পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেটা দেখানো হয়েছে। এটা পাওয়া গেছে ওয়েভ ফাংশনের বর্গ করে। বোঝাই যাচ্ছে যখন কণাটির শক্তি সবচেয়ে কম (E_0) তখন

এটাকে পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি পটেন্সিয়াল কূপের ঠিক মাঝখানে। শক্তি যখন E_1 তখন এটাকে মাঝখানে পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম, এটাকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি দুই পাশে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

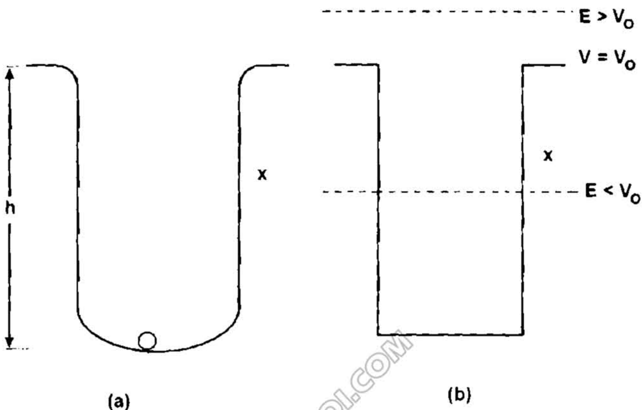

36 নং ছবি: (a) একটি গর্তের মাঝে একটা মার্বেল আটকা পড়ে আছে। মার্বেলটির গতিশক্তি যদি mgh থেকে বেশি হয় তাহলে সেটি গড়িয়ে উপরে উঠে আসতে পারবে। (b) একটা কণার জন্যে আমরা একই ধরনের একটা অবস্থার কথা কল্পনা করতে পারি। একটি পটেন্সিয়াল $V = V_0$ এর মাঝে একটি কণা আটকা পড়ে আছে। যদি এর শক্তি E, V_0 থেকে কম হয় তাহলে সেটা থাকবে গর্তের ভেতরে। যদি এর শক্তি V_0 থেকে বেশি হয় তাহলে সেটা পটেন্সিয়াল-এর বাইরেও চলে যেতে পারে।

কোনো-একটা কণা যখন কোনো-একটা পটান্সিয়াল কূপে আটকা পড়ে যায় আমরা তখন তাকে বলি বাউন্ড স্টেট (Bound State)। বাউন্ড স্টেটের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে পরমাণু, যেখানে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের কারণে

আটকা পড়ে থাকে। আমাদের পরিচিত জগতে সবচেয়ে সহজ পরমাণু হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাটম। হাইড্রোজেন অ্যাটমের শক্তিও নিরবচ্ছিন্ন নয়। 38 নং ছবিতে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তির বিচ্ছিন্ন রূপটি দেখানো হয়েছে। হাইড্রোজেন পরমাণুকে ডিসচার্জ করে তার থেকে যে-আলোগুলো বের হয়ে এসেছে সেই আলোর শক্তিগুলোই আসলে হাইড্রোজেন পরমাণুর সম্ভাব্য শক্তির স্তর।

18. কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিচিত্র ব্যবহার

এবারে আমরা এমন একটা জিনিসের কথা বলব যেটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স ছাড়া আর কোনোভাবে সম্ভব না। এটা বোঝানোর জন্যে আমরা 36 নম্বর ছবিতে ফিরে যাই, সেখানে একটা বিন্দুকে আমরা x নাম দিয়েছি। মার্বেলটা কি কখনো x বিন্দুতে পাওয়া সম্ভব হবে? আমি জানি তোমরা সবাই বলছ যে না, মার্বেলটা কোনোভাবেই x বিন্দুতে যেতে পারবে না এবং তোমাদের ধারণা সত্যি।

এবারে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মাঝে আসি। 36 নং ছবির দ্বিতীয় অংশের কণাটি কি x বিন্দুতে পাওয়া সম্ভব? যদি তোমরা মাথা ঠাণ্ডা করে এতক্ষণ কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়ে এসে থাক তাহলে তোমাদের বলা উচিত, সেটা নির্ভর করবে এই কণাটার ওয়েভ ফাংশনের উপর। যদি x বিন্দুকে ওয়েভ ফাংশনের কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেখানে কণাটা পাওয়ারও একটা সম্ভাবনা থাকবে। এবারে তাহলে এর পরের প্রশ্ন, x বিন্দুতে কি ওয়েভ ফাংশনের কিছু অবশিষ্ট থাকবে? সেটাও আমরা খুব সহজে শর্ডিংগারের সমীকরণে সমাধান করে বের করতে পারি। আমরা সমাধানটা কীভাবে আসে পরিশিষ্টে দেখিয়েছি, এখানে শুধুমাত্র তার সমাধানের ছবিটি 38 নং ছবিতে দেখিয়েছি। ছবিটির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে x বিন্দুতে আসলে ওয়েভ ফাংশনের মান শূন্য নয়—কাজেই এটাকে x বিন্দুতে পাওয়ার ছোট একটা সম্ভাবনা থাকে। মনে রেখো 37 নং ছবিতে আমরা যে-কূপটা দেখিয়েছিলাম তার দুই পাশে পটেন্সিয়াল ছিল অসীম। তাই সেই দেয়াল ভেদ করে কোনো ওয়েভ ফাংশন বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু যদি কোনো পটেন্সিয়াল কূপের উচ্চতা অসীম না হয়, তাহলে কিন্তু কোনো-একটা কণার সেটা ভেদ করে চলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়।

বিষয়টা 40 নং ছবিতে আরেকটু পরিষ্কারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বামদিক থেকে একটা কণা আসছে, তার সামনে একটা পটেন্সিয়ালের বাধা। কণাটির শক্তি E যেটা পটেন্সিয়ালের বাধা V_0 থেকে কম। আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী কণাটি কোনোভাবেই এই বাধা ভেদ করে যেতে পারবে না এবং সেটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী এর

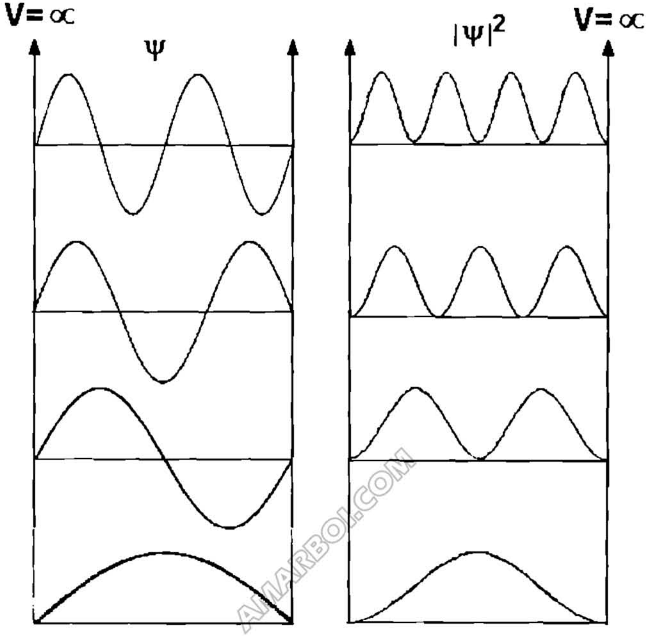

37 নং ছবি: একটা পটেন্সিয়াল কূপ, যার গভীরতা অসীম। বাম পাশে সেরকম একটা কূপে কোনো-একটা কণার ওয়েভ ফাংশন দেখানো হয়েছে। শক্তি নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে না সেটা শর্ডিংগাবের সমীকরণের সমাধান থেকে সরাসরি বের হয়ে এসেছে। সমাধান পাওয়া যায় শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন শক্তি E_0, E_1, E_2, E_3 ...ইত্যাদির জন্যে। ডান পাশের ছবিতে প্রোবাবিলিটি ফাংশন দেখানো হয়েছে। কণাটির কত শক্তি থাকলে তাকে কোথায় পাবার সম্ভাবনা কত সেটা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে।

ওয়েভ ফাংশনটির পটেন্সিয়ালের বাধা ভেদ করে অন্য পাশে চলে যেতে পারে। তাই দেখা যাবে ওয়েভ ফাংশনের খানিকটা পটেন্সিয়াল ভেদ করে অন্য পাশে চলে

এসেছে। 40 নং ছবিতে কণার প্রোবাবিলিটি ফাংশন দেখানো হচ্ছে। বামদিকের প্রোবাবিলিটি ফাংশন থেকে ডানদিকের প্রোবাবিলিটি ফাংশন যদি দশগুণ ছোট হয় তার অর্থ দশবার যদি কণাটি পটেন্সিয়াল বাধাকে আঘাত করে তাহলে একবার তার এই বাধা ভেদ করে বের হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

৩৪ নং ছবি: হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তির বিচ্ছিন্ন রূপ

কেউ যেন মনে না করে এগুলো আপনভোলা বিজ্ঞানীদের খেয়ালি কল্পনা। এটা মোটেও তা নয়। তোমরা সবাই আলফা বেটা এবং গামা রে-এর কথা শুনেছ। আলফা পার্টিকেল আসলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস—এটার আসলে নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়ে আসার কথা নয়। এটা বের হয়ে আসতে পারে কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্স পটেন্সিয়ালের একটা বড় বাধা অতিক্রম করায় সুযোগ দিয়েছে।

40 নং ছবিটি যারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেছে তারা হয়তো একটা ব্যাপার নিয়ে একটু ভুরু কুচকাতে পারে, আমরা ছবিতে শক্তি E_0-এর জন্যে একটি রেখা না এঁকে ওটাকে খানিকটা ছড়িয়ে দিয়েছি। এটা কিন্তু ভুল করে ঘটেনি। ইচ্ছে করেই এটা করা হয়েছে। আমরা অনিশ্চয়তার সূত্র থেকে জানি যদি অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাহলে ভরবেগ অনিশ্চিত হয়ে যায়। আমরা যেহেতু কণাটার প্রোবাবিলিটি ফাংশনটা নির্দিষ্ট একটা অবস্থানের জন্যে এঁকেছি—তাই তার ভরবেগ খানিকটা অনিশ্চিত হয়েছে—সে-কারণে শক্তিও অনিশ্চিত। কাজেই শুদ্ধ করে আমাদের বলা উচিত কণাটির গড় শক্তি E ছিল থেকে V_0 কম।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এই বিচিত্র ব্যবহারটি যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটত তাহলে আমরা কী দেখতাম? আমরা দেখতাম একটা ছোট ছেলে ছুটে এসে একটা দেয়ালকে ধাক্কা দিচ্ছে। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ ছোট ছেলেটা দেয়াল ভেদ করে অন্য পাশে চলে গেছে—দেয়াল যেরকম ছিল সেরকমই আছে!

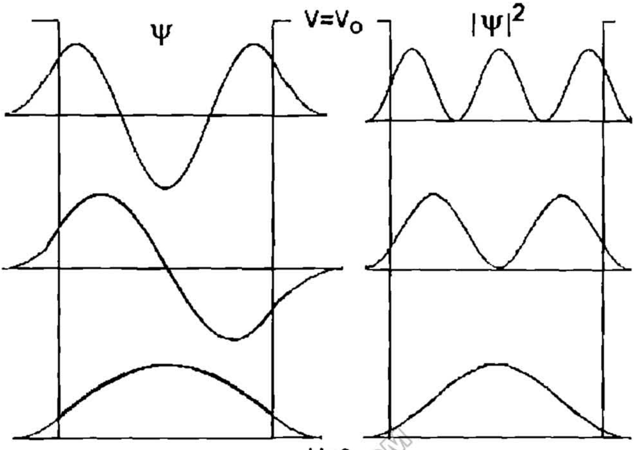

39 নং ছবি: পটেন্সিয়াল কূপে যদি কোনো কণা থাকে তাহলে তার যে-ওয়েভ ফাংশন থাকে সেটা কূপের বাইরেও বিস্তৃত হতে পারে। বামপাশে ওয়েভ ফাংশন-এবং ডানপাশে প্রোবাবিলিটি ফাংশন দেখানো হয়েছে। দেখাই যাচ্ছে x বিন্দুতে কণাটি পাওয়ার একটু সম্ভাবনা রয়েছে।

19. এনটেঙ্গলমেন্ট

এনটেঙ্গলমেন্ট (Entanglement) খুব সহজভাবে বোঝা যায় এভাবে : একটা বাক্সে এক জোড়া হাতমোজা রয়েছে—তোমরা সবাই জান হাতমোজার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এক হাতের হাতমোজা অন্য হাতে পরা যায় না। একটা হাতমোজা হয় বাম হাতের আরেকটা হয় ডান হাতের। এবারে কল্পনা করো তুমি আর তোমার বন্ধু এসে চোখ বন্ধ করে দুইজন দুটো হাতমোজা নিয়ে পকেটে ভরে চলে গেলে। তুমি ট্রেনে করে গেলে চট্টগ্রাম তোমার বন্ধু গেল দিনাজপুর। তোমরা দুইজনই জান তোমাদের একটা করে হাতমোজা আছে কিন্তু কার কাছে কোন হাতের হাতমোজা রয়েছে তোমরা জান না। ধরা যাক গভীর রাতে তুমি পকেট

থেকে তোমার হাতমোজাটা বের করে দেখলে সেটা বাম হাতের হাতমোজা, সাথে সাথে তুমি জেনে যাবে তোমার বন্ধুর হাতমোজাটা হবে ডান হাতের। সে পকেট থেকে খুলে বের করার আগেই তুমি নিশ্চিতভাবে এটা বলে দিতে পারবে।

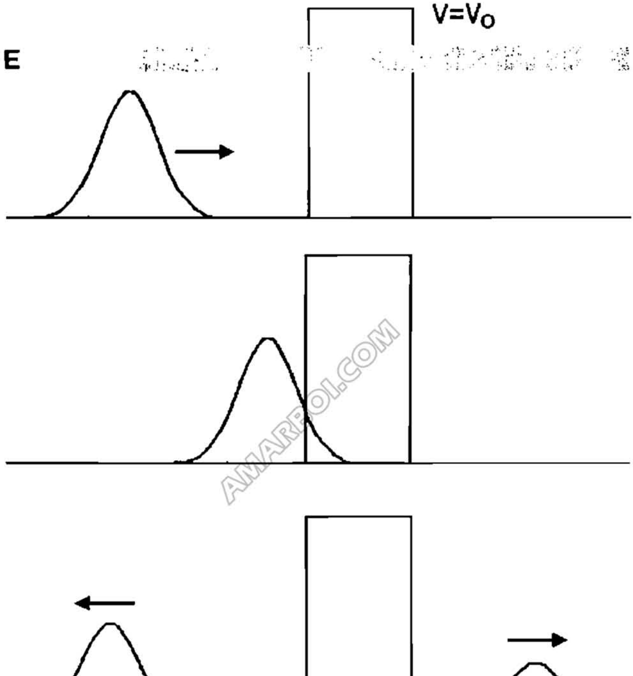

40 নং ছবি: একটি কণা বামদিক থেকে একটা পটেন্সিয়ালের বাধার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কণাটির শক্তি E পটেন্সিয়ালের বাধা V_0 থেকে কম—তার পরও কণাটির ওয়েভ ফাংশনের একটা অংশ বাধা ভেদ করে ডান দিকে চলে যেতে পারে।

আমরা বাড়াবাড়ি রকম সোজাভাবে বললে বলতে পারি হাতমোজা দুটি এনটেঙ্গলড হয়েছিল। তাই একটার সম্পর্কে জানামাত্রই অন্যটা সম্পর্কে জানা হয়ে গেল।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সও এরকম হতে পারে, দুটো কণা এমনভাবে এনটেঙ্গলড হয়ে থাকতে পারে যে একটা সম্পর্কে জানলে অন্যটা সম্পর্কে জানা হয়ে যেতে পারে। তবে যেহেতু কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে কথা—তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পার এটা নিয়ে মহা ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায়। আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তিনটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের কথা বলেছিলাম, একটা হচ্ছে শক্তি হয় বিচ্ছিন্ন বা কোয়ান্টার, এবং দ্বিতীয়টি ছিল সবকিছুর প্রোবাবিলিটি অ্যামপ্লিচুড থাকে তার বর্গ হচ্ছে কোনোকিছু পাওয়ার সম্ভাবনা। তৃতীয়টি ছিল সবচেয়ে চমকপ্রদ, একটা ওয়েভ ফাংশনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের প্রোবাবিলিটি অ্যামপ্লিচুড থাকতে পারে—পর্যবেক্ষণ না করা পর্যন্ত আমরা জানি না কোনটা সত্যি। শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করা হলেই এটা নির্দিষ্ট একটা অবস্থানে পাওয়া যায়।

এবারে হাতমোজার ব্যাপারটা আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মতো করে দেখি। ধরা যাক এগুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হাতমোজা—যার অর্থ পর্যবেক্ষণ না করা পর্যন্ত এটা একই সাথে ডান এবং বাম হাতের দুটি হাতমোজার সংমিশ্রণ। শুধুমাত্র চোখ খুলে দেখলে বা পর্যবেক্ষণ করলেই এটা হয় ডান হাত নাহয় বাম হাতের হাতমোজা হয়ে যায়। কাজেই তুমি যখন পকেটে করে এনেছ তুমি কিংবা তোমার বন্ধু কেউই জানো না কার কাছে কোনটি।

ধরা যাক তুমি একসময় ঠিক করলে তুমি এবারে দেখবে তোমার কাছে কোন মোজাটি আছে—অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ করলে। যেই মুহূর্তে তুমি পর্যবেক্ষণ করলে সেই মুহূর্তে হাতমোজাটি একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করল। ধরা যাক সেটা হয়ে গেল বাম হাতের হাতমোজা—সেই মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো তোমার বন্ধুর হাতমোজাটি হয়ে যাবে ডান হাতের হাতমোজা। তোমার বন্ধু তোমার পাশেই থাকুক আর তোমার থেকে এক মিলিয়ন মাইল দূরেই থাকুক।

বিষয়টি বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে এটা দেখিয়েছেন। এক জায়গায় একটা পর্যবেক্ষণ করার ফলাফলটি মিলিয়ন বিলিয়ন মাইল দূরে অন্য কোথাও একটা পরিবর্তন করে ফেলে।

এই বিষয়টার একটা সুদূরপ্রসারী ফল হতে পারে—যেটা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না।

20. শেষ কথা

আমরা এতক্ষণ কোয়ান্টাম মেকানিক্স নামে পদার্থবিজ্ঞানের একটা নতুন ধারণা জানার চেষ্টা করেছি। এবারে আমরা আমাদের আলোচনাটি শেষ করব কিছু তথ্য দিয়ে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত কণা আছে তাদের সবগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগের নাম ফারমিওন (Fermion), বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নাম অনুসারে। অন্য ভাগের নাম বোজন (Boson), আমাদের সত্যেন বোসের নাম অনুসারে। কেউ যদি একটু চিন্তা করে দেখে সে নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি হয়ে যাবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কণার অর্ধেকের নামকরণ করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একজন বাঙালি অধ্যাপকের নামে।

পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেসব কণা দিয়ে তৈরি হয়েছে তার ভেতরে যেগুলো ফারমিওন সেগুলোকে বলা হয় বস্তুকণা। যেগুলো বোজন সেগুলো এই বস্তুকণার ভেতরে বল বা শক্তির আদানপ্রদান করে। ফারমিওন নামের বস্তুকণাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগের নাম কোয়ার্ক অন্য ভাগের নাম লেপটন। কাজেই আমরা লিখতে পারি :

ফার্মিওন

কোয়ার্ক	u	আপ কোয়ার্ক
	d	ডাউন কোয়ার্ক
লেপটন	e	ইলেকট্রন
	ν_e	ইলেকট্রন নিউট্রিনো

কাজেই নিউট্রন এবং প্রোটন তৈরি হয় আপ ও ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে (পরিশিষ্ট 4)। ই এটা মোটেও অত্যুক্তি নয় যে, আমাদের পরিচিত দৃশ্যমান জগতের পুরোটাই তৈরি হয়েছে u, d এবং e (আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক এবং ইলেকট্রন) এই তিনটি মাত্র কণা দিয়ে। ν_e (ইলেকট্রন নিউট্রিনো)-এর অস্তিত্ব রয়েছে তবে সেটি সাধারণ মানুষের চোখে দৃশ্যমান নয় কিন্তু পুরোপুরি সঠিকভাবে বলার জন্যে আমাদের এটাকেও গ্রহণ করতে হবে। এটা মোটামুটিভাবে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, পরিচিত পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড u, d, e এবং ν_e এই চারটি কণা দিয়েই তৈরি করা সম্ভব।

তবে শুধু যে এই চারটি কণা রয়েছে তা নয়, এর সাথে সাথে এই কণাগুলোর প্রতি পদার্থও রয়েছে। কাজেই আমাদের তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ করতে হলে ফার্মিওনের

এই পরিবারে তাদের প্রতি পদার্থগুলো যোগ করতে হবে। কাজেই তালিকাটি হবে এরকম :

ফার্মিওন

	পদার্থ	প্রতি পদার্থ
কোয়ার্ক	u d	$\bar{u}$ $\bar{d}$
লেপটন	e ν_e	$\bar{e}$ $\bar{\nu}_e$

উপরের কণাগুলো হচ্ছে বস্তুকণা, এদের ভেতর বল বা শক্তির বিনিময় করার জন্যে আমাদেও অন্য কিছু কণার দরকার এবং এই কণাগুলোর নাম হচ্ছে বোজন। এই কণাগুলো হচ্ছে :

বোজন

ফোটন	γ	কোয়ার্ক ও ইলেকট্রনের ভেতর শক্তি বিনিময়
জি নট ডাবলিউ প্লাস/ডাবলিউ মাইনাস	Z^0 W±	সকল ফার্মিওনের ভেতর শক্তি বিনিময়
গ্লুয়োন	g	শুধু কোয়ার্কের ভেতর শক্তি বিনিময়

সংগত কারণেই মনে হতে পারে এই বোজনকণার প্রতি পদার্থগুলো আমাদের তালিকায় নেওয়া দরকার। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বস্তুকণার ভেতরে বল বা শক্তি আদানপ্রদানকারী এই বোজনকণাগুলো নিজেরাই নিজেদের প্রতি পদার্থ। এখানে আমরা আমাদের পরিচিত ফোটন বা আলোর কণাকে নিশ্চয়ই দেখছি, অন্যগুলোর অস্তিত্ব খুব ভালোভাবেই আছে কিন্তু খাটি পদার্থবিজ্ঞানী ছাড়া অন্যরা তাদের খবর রাখে না।

কাজেই একজন মোটামুটি এই ভেবে আনন্দ পেতে পারত যে, মাত্র চারটি ফার্মিওন এবং পাঁচটি বোজন দিয়েই এই মহাবিশ্বের সকল পদার্থের গঠন ব্যাখ্যা করা সম্ভব—কিন্তু আসলে ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত এত সহজ থাকেনি। দেখা গেল ফার্মিওনের যে-পরিবারটির কথা বলা হয়েছে সেটা যথেষ্ট নয়। ঠিক এরকম আরও

দুটো পরিবার দরকার। u, d, e, γ_e এর পরিবারটিকে প্রথম প্রজন্ম বলে আমরা হুবহু এরকম আরও দুটি প্রজন্ম প্রস্তুত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে :

দ্বিতীয় প্রজন্ম

কোয়ার্ক	c	চার্ম
	s	স্ট্রেঞ্জ
লেপটন	μ	মিউওন
	ν_μ	মিউওন নিউট্রিনো

তৃতীয় প্রজন্ম

কোয়ার্ক	t	টপ
	b	বটম
লেপটন	τ	টাও
	ν_τ	টাও নিউট্রিনো

এবং অবশ্যই তার সাথে সাথে রয়েছে তাদেও প্রত্যেকটির প্রতি পদার্থ।

আমরা যদি প্রতি পদার্থগুলো আলাদাভাবে না লিখি তাহলে ছোট একটা ছকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল মৌলকণা লিখতে পারি।

	ফার্মিওন			বোজন
	প্রথম প্রজন্ম	দ্বিতীয় প্রজন্ম	তৃতীয় প্রজন্ম	
কোয়ার্ক	u d	c s	t b	γ Z^0
লেপটন	e ν_e	μ ν_μ	τ ν_τ	$W\pm$ g

এই সকল কণা ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানের যে-মডেল দিয়ে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা হয় সেটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড মডেল। যে কণাগুলো দেখানো হয়েছে তাদের ভর নির্ধারণ করার জন্যে হিগস বোজন (Higgs Boson) নামে আরও একটি বোজনের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে—তবে প্রকৃতিতে আসলেই সেটা আছে কি নেই এখনো কেউ জানে না।

পরিশিষ্ট

1. কমপ্লেক্স সংখ্যা

$x = x + iy$

যেখানে $i = \sqrt{-1}$

$$z = x - iy$$

$$z^* = x + iy$$

$$|z|^2 = zz^* = (x - iy)(x + iy) = x^2 + y^2$$

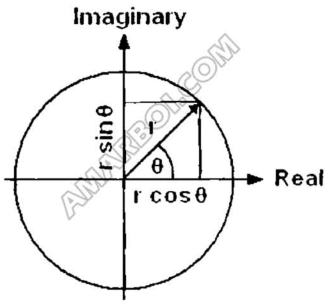

অন্যভাবেও কমপ্লেক্স সংখ্যা লেখা যায়:

$$z = re^{i\theta}$$

যেখানে $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

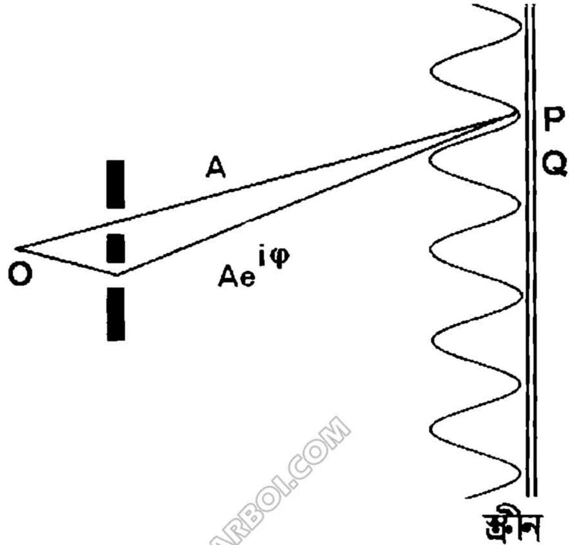

2. ডাবল স্লিটের পরীক্ষা

দুটি স্লিট থেকে দুটি প্রোবাবিলিটি অ্যামিপ্লিচুড আসে A এবং $Ae^{i\varphi}$

(i) আমরা যখন যোগ করে বর্গ করি তখন পাই

$$|A + Ae^{i\varphi}|^2 = |A|^2 (1 + e^{i\varphi}) (1 + e^{i\varphi})$$

$= 2|A|^2 (1 + \cos\varphi)$ এটি ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন দেখায়

(ii) আমরা যখন বর্গ করে যোগ করি :

$$|A|^2 + |Ae^{i\varphi}|^2 = 2|A|^2$$

কোনো ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন থাকে না।

3. শর্ডিংগারের সমীকরণ

$$\left(-\frac{h^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V\right)\Psi = E\Psi$$

$$\left(-\frac{h^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+(E-V)\right)\Psi = 0$$

এর সমাধান :

$$\Psi = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

যেখানে $k^2 = \frac{2m(E-V)}{h^2}$ এবং A ও B দুটি ধ্রুবক।

4. নিউট্রন ও প্রোটন

u কোয়ার্কের চার্জ $\frac{2}{3}$

d কোয়ার্কের চার্জ $-\frac{1}{3}$

প্রোটন তৈরি হয় uud মোট চার্জ: $(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}+-\frac{1}{3}) = 1$

নিউট্রন তৈরি হয় udd মোট চার্জ: $(\frac{2}{3}-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}) = 0$